কিশোর ভারতী

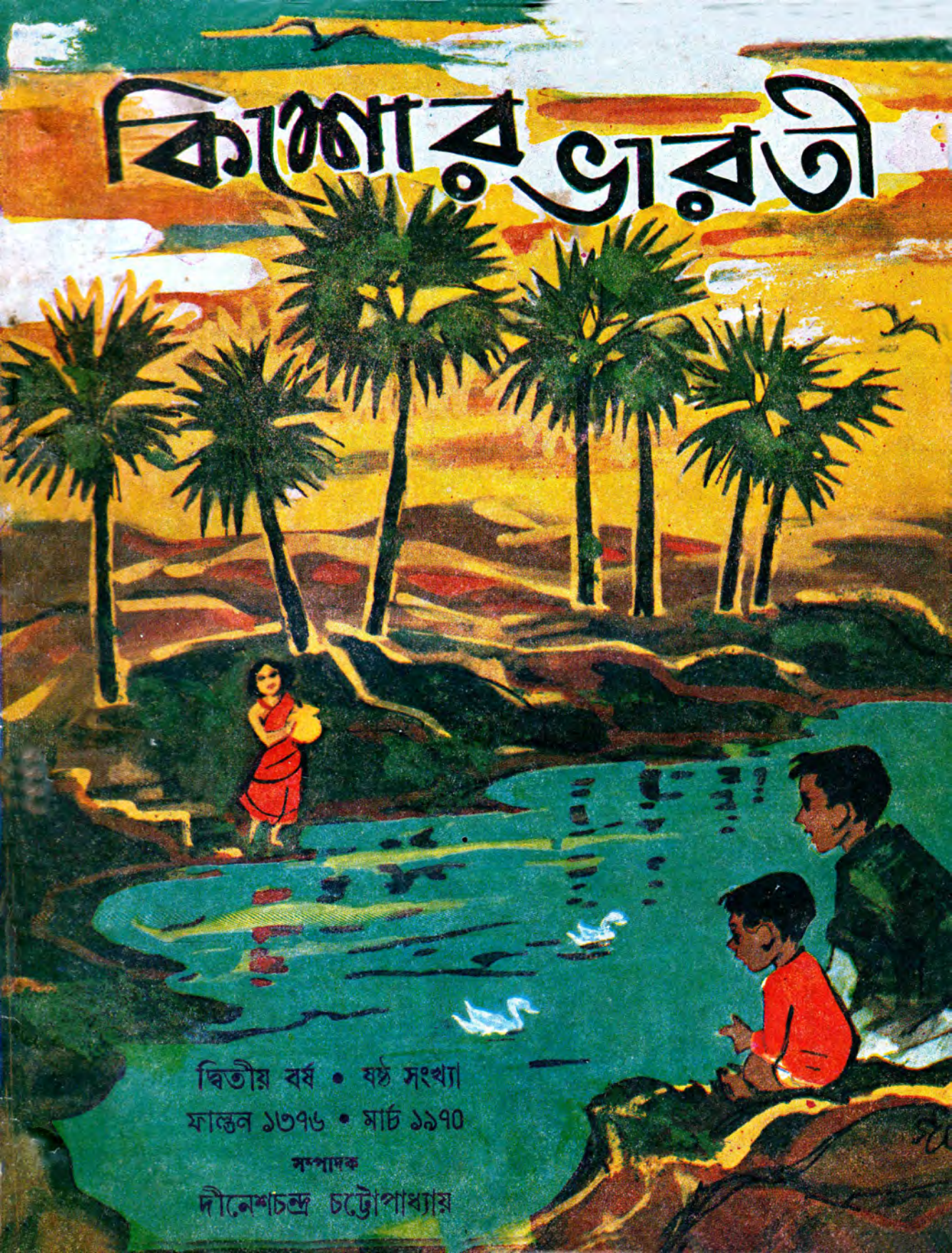

দ্বিতীয় বর্ষ • ষষ্ঠ সংখ্যা
ফাল্গুন ১৩৭৬ • মার্চ ১৯৭০

সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : শ্রুভাবতী চক্রবর্তী

স্ক্যান ও এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

কিশোর ভারতী

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সুধীজনের সুচিন্তিত অভিমত

দেশ

প্রথম সংখ্যা থেকেই আলোচ্য পত্রিকাখানি কিশোর সমাজে বেশ একটা সাড়া জাগিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে, তার কারণ এতে পরিবেশিত লেখাটেখা। মনোরঞ্জন করার মত আঙ্গিক সৌষ্ঠবের সঙ্গে কিশোরদের জানবার ও উপভোগ করার মত রচনাবলীর সমাবেশে আলোচ্য বিশেষ সংখ্যাখানি (নববর্ষ সংখ্যা) সাম্প্রতিক কালের একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রকাশন। নামকরা লেখকদের অনেকেরই রচনা এতে আছে। রচনাবলীর মান বেশ উঁচু যা কিশোরদের মজা উপভোগের সঙ্গে জ্ঞানলাভে সহায়ক হবে। **কিশোরদের একটি অবশ্য সংগ্রহীতব্য পত্রিকা।**

যুগান্তর

ছোটদের চোখের সামনে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দেওয়ার কাজ হল বড় কঠিন। ছোটদের মনের মতো করে, আর জানার মতো সব কিছুকে সহজ সরল ও আকর্ষণীয় করে তোলার কাজই সব চেয়ে শক্ত। বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে যা হয় না, বাঁধাধরা নিয়মে যেখানে ছোটরা হাঁপিয়ে ওঠে, তার বাইরেই এই মহান কাজ।.....**ছেলেমেয়েদের মানুষ হতে শেখার এক আনন্দমেলা সৃষ্টি করেছেন কিশোর ভারতী।** তাঁদের সহায়তা করেছেন বাংলার সব নবীন-প্রবীণ লেখক। সুন্দর ছাপা, ছবি ও মনোরম বিষয়-বৈচিত্র্যে এই সংকলন (নববর্ষ সংখ্যা) অনবদ্য।

সাপ্তাহিক বসুমতী

এটি নববর্ষ সংখ্যা। এর আগে সাতটি সংখ্যা বের হয়েছে। কিশোর ভারতীর আগেকার প্রতিটি সংখ্যাই আমাদের খুশী করেছে, বলা বাহুল্য কিশোরদেরও মন জয় করেছে। **বাংলা ভাষায় এই ধরনের পত্রিকা কল্পনা করা যায় নি।** কারণ ব্যবসায়ে মুনাফা করাটাই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে **সংখ্যায় সংখ্যায় অবাক করার মতো পত্রিকা** বের করতে হলে ব্যয়ের ধাক্কা সামলানো কঠিন। কিন্তু কিশোর ভারতীর ছাপা, মলাট ও কাগজ তো খুব ভালো বটেই, উপরন্তু আছে পাতায় পাতায় ছবি। **রেখার সঙ্গে লেখার এবং লেখার সঙ্গে রেখার এমন অপূর্ব সমন্বয় কদাচিৎ দেখা যায়।** নববর্ষ সংখ্যাটির দাম আড়াই টাকা হলেও পত্রিকার উৎকর্ষের কাছে তা নগণ্য বলে মনে হয়। **এরপর আছে কতোরকমের ফিচার আর বড় লেখকদের প্রিয় লেখা।** যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প নববর্ষ সংখ্যায় রয়েছে। এছাড়া আছে নানান ধরনের গল্প। যেমন হর্ষবর্ধনের গল্প, সামাজিক গল্প, হাসির গল্প, বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্য গল্প, ম্যাজিকের গল্প, মিষ্টি গল্প। কাহিনীর সংখ্যাও প্রচুর! গোয়েন্দা কাহিনী থেকে সুরু করে বিজ্ঞানের সরস কাহিনী। কাব্যনাটিকা, জীবজগতের কথা, ছড়া ও কবিতা, বিজ্ঞানীর দপ্তর, গ্রাহক-গ্রাহিকার লেখার আসর, খেলাধুলো ও ব্যায়াম, ভালো বইয়ের আলোচনা, ছবিতে গল্প, সওয়াল জবাব, টুকরো হাসি, জাদুবিদ্যা, ধাঁধা-হেঁয়ালি ও কবিগুরু স্মরণে তো আছেই এবং আছে আরো অনেক কিছু—যা গ্রীষ্মাবকাশের ছুটিতে ছেলেরা খুব মজা করে পড়তে পারবে। লেখকের সংখ্যাও অনেক। তাঁদের মধ্যে শিবরাম চক্রবর্তী, আশাপূর্ণা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শক্তিপদ রাজগুরু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে ছেলেরা বেশ চঞ্চল হবে, খুশি হবে, তৃপ্ত হবে। সুন্দর প্রচ্ছদপট এঁকেছেন সূর্য রায়।...

ইন্দিরা দেবী

স্বপ্নের ভারতের কথা যখন ভাবি, চোখের সামনে ভেসে ওঠে যাদের মুখ, তাদের মনের ছবি ধরা পড়েছে—কিশোর ভারতীর পাতায়...**কিশোর ভারতীর প্রচেষ্টা শুধুই সাহিত্যিক প্রচেষ্টা নয়, একটি মহৎ সাহিত্যের প্রেরণা বলে মনে করি। কিশোর মনের দিশারী—রূপরসগন্ধ-বৈচিত্র্যে এর পৃষ্ঠায় তারা খুঁজে পাচ্ছে রুচি-স্নিগ্ধ মহৎ জীবনের আদর্শ।**...

কিশোর ভারতী

॥ কেন্দ্রীয় সংবাদ-পত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮নং ধারা অনুযায়ী বিবৃতি ॥

১. প্রকাশস্থান	ঃ	১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯
২. প্রকাশকাল		মাসিক
৩. মুদ্রাকরের নাম		শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
জাতি		ভারতীয়—ভারতের নাগরিক
ঠিকানা		১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯
৪. প্রকাশকের নাম	ঃ	শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়
জাতি	ঃ	ভারতীয়—ভারতের নাগরিক
ঠিকানা	ঃ	১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯
৫. সম্পাদকের নাম	ঃ	শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জাতি	ঃ	ভারতীয়—ভারতের নাগরিক
ঠিকানা	ঃ	১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯

৬. **'পত্রভারতী'**র পক্ষে যে সকল ব্যক্তি এই পত্রিকার মালিক এবং যাঁহারা মোট মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশীদার, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা ঃ

(ক) শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯
(খ) শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ
(গ) শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ
(ঘ) শ্রীমতী গৌরী দেবী ঐ
(ঙ) শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ

আমি, শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(স্বাক্ষর)
শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক

তারিখ ঃ ১-৩-৭০

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত। [২৬. ৬. ৬৯ তারিখের টি. বি. নং ১ দ্রষ্টব্য]

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক স্কুল লাইব্রেরীসমূহে ব্যবহারের জন্য ও প্রাইজ-পুস্তক হিসাবে সুপারিশকৃত। [২৫. ৯. ৬৯ তারিখের ২২/৬৯ নং সার্কুলার দ্রষ্টব্য]

'পত্র-ভারতী'র প্রকাশনায়

কিশোর ভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ • ষষ্ঠ সংখ্যা
ফাল্গুন ১৩৭৬/মার্চ ১৯৭০

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

আমাদের কথা ৫৮১

মামাবাবুর রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনী ঃ ধারাবাহিক উপন্যাস

পাহাড়ের নাম করালী—প্রেমেন্দ্র মিত্র ৬২০

হাসির গল্প

'বড়ে'র চাল—শক্তিপদ রাজগুরু ৫৮২

বিশ্বসাহিত্যের সেরা গল্প

কাউন্টেসের মণি ঃ আর্থার কোনান ডয়েল—বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১৬

কবিতা, ছড়া ও লিমেরিক

ফাল্গুনে—আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০০
লিমেরিক—পরিতোষকুমার চন্দ্র ৬০০
ইচ্ছে করে—তারকনাথ চৌধুরী ৬০০
কিশোর ভারতীকে ঃ তোতোন—মৃদুল দাশগুপ্ত ৬০০
নিঝুম রাতের ছড়া—গৌতম গোস্বামী ৬০১
কৈশোর—অশোক হালদার ৬০১
মিথ্যে বলিনি দাদা—কাশীনাথ দাশ চাক্‌লাদার ৬০১

মরু-গিরি-কান্তারে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ঃ ধারাবাহিক উপন্যাস

দুরন্ত ঈগল—দীননাথ কাশ্যপ ৫৯৪

মিষ্টি গল্প

মহান্ত জ্যাঠামশাইয়ের গল্প—শুভা কর ৫৯২
সর্ষের মধ্যে ভূত!—লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ ৬১২

জলদস্যুদের রোমাঞ্চকর কাহিনী

বোম্বেটে জাহাজ 'আটলান্টিস'—ইন্দুভূষণ দাস ৫৮৮

রূপকথা

পরগাছা—অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য ৬০৯

জীবজগতের রোমাঞ্চকর কাহিনী

পশুরাজের বিদ্রোহী প্রজা—ময়ূখ চৌধুরী ৬০৪

দুঃসাহসের গল্প

আমি পেরেছি—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ৬০২

প্রাচীন শিকার কাহিনী

সাঁওতালী শিকার-উৎসব ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ৬১০

কিশোর জীবনের অমর কথা

নাম ছিল যার অ্যান ফ্রাংক—দেবব্রত রায় ৬২৪

গল্পের যাদুঘরে

স্বপ্নের ফল—বাউল দাশ ৬১৫

অতীতের পাতা থেকে

ইতিহাসের দিনলিপি—মহাকাল রায় ৬২৭

বিজ্ঞানীর দপ্তর

ম্যাজিক স্কোয়ার বা যাদুবর্গ—অমরনাথ রায় ৬৪১

গ্রাহক-গ্রাহিকার আসর

বসন্ত (নাটিকা)—শ্যামাচরণ মিশ্র ৬৩১

নির্জন নদীতটে (কবিতা)—অনিতা রায়চৌধুরী ৬৩৩

ভুল (গল্প)—আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩৩

খোলামনের মেলাতে

সুজনবন্ধুর বৈঠক ৬৩৪

জাদুবিদ্যা

ছোট্ট তিনটি জাদুর খেলা—পরিচালক ঃ কিশোর জাদুকর ৬৪৩

ধাঁধা-হেঁয়ালি

ধাঁধা ৬৩৬

গত মাসের শব্দ-হেঁয়ালির উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ৬৩৭

রূপ-রঙ্গ

তুমি কি কেবলি ছবি...—মনোরঞ্জন ঘোষ ৬৩৮

খেলাধুলা

ব্যাটিং করার গোড়ার কথা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪৪

খেলার জগতের নানা খবর—বিশ্বনাথ ৬৪৫

খেলার আসর—শ্রীসাংবাদিক ৬৪৬

সওয়াল-জবাব

প্রশ্নোত্তর-বিভাগ—বাণী মৌলিক ৬৪৭

টুকরো হাসি

একটু হাসো!—আশীষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২৬

সংবাদ-বিচিত্রা

রকম রকম জানবার কথা—বাদল বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯১

ছবিতে হাস্যকৌতুকের ধারাবাহিক গল্প

ডমরু-চরিত—শৈল চক্রবর্তী ৬০৮

ছবিতে অভিনব সরস কাহিনী

নন্টে আর ফন্টে—নারায়ণ দেবনাথ ৬২৬

প্রচ্ছদ

ভোরের পুকুরে—শিল্পী সূর্য রায়

প্রাপ্তিস্থান

কিশোর ভারতী কার্যালয়॥ ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ॥ ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯
ডিএনবিএ ব্রাদার্স॥ ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯
এবং বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত **বইয়ের দোকান ও পত্রপত্রিকার স্টল**

মূল্য ঃ পঁচাত্তর পয়সা

'পত্র-ভারতী'র পক্ষে দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

আমাদের কথা

স্নেহের বন্ধুগণ,—বাংলা দেশে বসন্ত এসেছে। ঋতুরাজ এসেছে তার রূপ-রস-গন্ধের বর্ণাঢ্য মিছিল নিয়ে। কান পাতলে শোনা যায় তার গানের বিচিত্র মধুর সুর। সে সুর যেন বলে,—ওঠ, জাগ, আমাকে বরণ করে নাও! আমি যে চিরসুন্দর যৌবনের প্রতীক! নিত্যনতুন সাজে প্রতি বছরই আসি আমি। আমি চিরনতুন।

কিন্তু কে শুনবে তার কথা? তাকে আবাহন করবার মতো মন কোথায় মানুষের?

রোগে, শোকে ও অভাবের যন্ত্রণায় পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ আজ ধুঁকছে—ফুঁকছে। সারা দেশ টালমাটাল। যে কোন সময় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটতে পারে।

এরই মাঝে আসছে বি. কম্., বি. এ. ও বি. এসসি. পার্ট ওয়ান এবং হাইয়ার সেকেণ্ডারী ও স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা। তোমরা অনেকেই সেখানে পরীক্ষার্থী। দীর্ঘ দিন ধরে তোমরা এই আসন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে কি রকম পরিশ্রম করে চলেছ, তা আমরা জানি। দেশের কল্যাণকামী প্রতিটি মানুষই আজ চাইবেন, তোমাদের এই পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক এবং শান্ত পরিবেশে তোমরা পরীক্ষা শেষ করো।

জানি না, আমাদের এই চাওয়া বা কামনা বাস্তবে রূপ পাবে কিনা। জানি না, পরীক্ষা যাতে কোনভাবে ব্যাহত না হয়, তার জন্য দেশের মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে কিনা। দেশব্যাপী সাংঘাতিক ভাঙনের মুখে সব কিছুই আজ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

তবু একান্ত মনে প্রার্থনা করি, পরীক্ষার জন্য তোমাদের এই চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম এবং তোমাদের বাবা-মা ও অভিভাবকদের স্বপ্ন-সাধ ও অর্থব্যয় যেন ব্যর্থ না হয়, পরীক্ষায় তোমরা সর্বাঙ্গীণ সফলতা লাভ করো।

দেশের দিকে তাকিয়ে মন আজ অশান্ত অস্থির, অব্যক্ত ব্যথায় ভারাক্রান্ত। চারিদিকে অন্ধকার আর অন্ধকার। দিনে দিনে সে অন্ধকার গাঢ়তর হচ্ছে। অসহায় মূক বেদনায় একটা প্রশ্নই শুধু গুমরে ফেরে সে অন্ধকারে—আলো, কোথায় আলো?

তারপরই হঠাৎ মনের মাঝে ভেসে ওঠে তোমাদের উজ্জ্বল মুখগুলি—আমার স্নেহের বন্ধুদের অসংখ্য কচি কচি মুখ। জিজ্ঞাসার উত্তরও ঝল্‌কে ওঠে মনের মাঝে, শুনতে পাই—আগামী দিনের ওরাই তো সেই আলোকের দূত, আলোর পথিক, ওরাই সেই দৃপ্ত মশাল! তাই হতাশ হয়ো না। যত গাঢ়ই হোক আজ নৈরাশ্যের অন্ধকার, ওদের জ্ঞান ও কর্মের আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠবে আগামী দিন, অন্ধকার দূর হবে চিরতরে।

সুতরাং বুঝতে পারছো তোমরা—কতখানি আশা-ভরসা নিয়ে আমরা দেশের মানুষ আজ তাকিয়ে আছি তোমাদের দিকে। ভবিষ্যৎ তো তোমাদেরই।

আজ আমাদের কামনা শুধু একটাই, তা হলো—দেশের এই আশা-ভরসার যোগ্য হও তোমরা। আমাদের ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন রূপায়িত হোক তোমাদের মধ্য দিয়ে।

এবার একটা শোক-সংবাদ দিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করবো।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও সাহিত্য-সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার ৭৮ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। ১৮৯২ সালের ২৩শে মার্চ বীরভূমের হাতিয়ায় তাঁর জন্ম হয়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল রত্ন এবং প্রখ্যাত একজন সাহিত্যসেবী।

আজ এই পর্যন্ত। তোমরা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্নেহাশিস্ গ্রহণ করো। ইতি—

তোমাদের **সম্পাদক বন্ধু**

'বড়ে'র চাল

শক্তিপদ রাজগুরু

নকুলের গোলমামা শেষ অবধি দাবা খেলতে গিয়ে হাসপাতালের বিছানায় গিয়ে হাজির হলেন। অবশ্য তার আগে কদিন আমাদের খুব ন্যাটা ঝামটা খাইয়ে গেল লোকটা। আমার কপালের আমড়ার আঁঠির মত ফুলে ওঠা জায়গাটা এখনও ঢিপ্ হয়ে আছে, আর নকুলের ঠ্যাংয়ের দরদ এখনও যায়নি, এন্তার চুন হলুদ লাগিয়ে যাচ্ছে এখনও। আর গুপী ময়রার মনোরমা কেবিনের ঘসা কাঠের একটা পার্টিশন-দরজা এখনও আধভাঙ্গা রয়ে গেছে। টুকরো টাক্‌রা এমন অনেক কান্ডই বাধিয়েছিল নকুলের গোলমামা ওই দাবাখেলার ব্যাপার নিয়ে।

এ যেন রীতিমত গড়ের মাঠের ফুটবল খেলার মতই ব্যাপার, সেখানে যেমন মাঝে মাঝে ইট পাটকেল সোডার বোতলে রেফারি লাইনস্‌ম্যান দর্শক এমনকি খেলোয়াড়রাও চোট পায়, গোলমামার দাবাখেলার জেরও প্রায় তেমনিই হয়ে উঠেছিল। শুধু ওই খেলার মাঠের কান্ডটা কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়, এটা অবশ্যি হয়ে ওঠেনি, তবে হবারই কথা। কারণ গোলমামার কাছে দাবা খেলাই নাকি জীবনের সবচেয়ে বড় খেলা।

বুঝলি নক্‌লো, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এত বড় জেনারেল হয়েছিল কেন জানিস?—মামা আচমকা হুমকি ছাড়েন।

গোলাকার চেহারা ওর মামার। এককালে বিরাট চাকরি করতেন বাইরে, এখন রিটায়ার করে স্রেফ দাবা খেলছেন। দিনকতক একটু কলকাতা ঘুরতে এসেছেন। পয়সাওয়ালা লোক—ভালোমন্দ খেয়ে আর ঘুমিয়ে শরীরটা গোলগাল হয়ে উঠেছে, তাই ওরা ওকে গোলমামা বলেই ডাকে। নক্‌লো ভেবেছিল, শাঁসালো মামা এসেছেন কলকাতা দেখতে, তবু দিনকয়েক মামার কাঁধে চেপে হোটেল রেস্টুরেন্টে চপ-কাটলেট গিলবে, এদিক ওদিক ঘুরবে।

মামা কিন্তু ইতিমধ্যে এদিক ওদিকের রকে কোন্ বুড়োর দল বসে দাবা খেলে, কোন্ পার্কের ঘাসে দাবার ছক পড়ে, সবই দেখে ফেলেছেন। তাদের দু একদলের সঙ্গে দহরম মহরমও করেছেন। অবশ্য বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন, মুখে বোম্বাই মার্কা জাভা ডসন্ চুরুট ধরিয়ে দাবার ছক নিয়ে চাল দেন নিজে নিজেই।

নক্‌লোকে চুপ করে থাকতে দেখে মামা খাপ্পা হয়ে বলেন—কিস্‌সু জানিস না।

নক্‌লো ইতিহাস যেটুকু পড়েছে তাতে নেপো-

লিয়ানের দাবা খেলার ব্যাপার কিছু আছে কিনা ভাবতে পারছে না। মামা বলেন সেই গূঢ় তত্ত্বটুকু— স্রেফ দাবা খেলে, বুঝলি, দাবা খেলে নেপোলিয়ান মহারথী হয়ে উঠেছিল। আরে আজকে রাশিয়ার তাকত দেখছিস তো? জার্মানদের পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দিলে। কি করে?.....কে? এই যে এদিকে এসো ছোকরা—

বাজখাঁই গলার গর্জন আর ওই ধমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি। হুকুম হচ্ছে—এদিকে এসো।

ওই ভারী গলার বুলডগের মত গর্জন অগ্রাহ্য করার সাধ্য নেই। মনে হয় কি যেন কুকর্ম করতে এসে ধরা পড়ে গেছি। নকুলের গোলমামার কথা শুনেছিলাম। আমিও ভেবেছিলাম নতুন শাঁসালো মামার ভাগ্নের বন্ধু আমি, হয়তো ছিটে-ফোঁটা আমার বরাতেও কিছু জুটবে। নেহাত কৌতূহল বশেই এসেছিলাম। তাছাড়া আজ ক্রিকেট ম্যাচ আছে। নকুলের ব্যাটটা দরকার। কিন্তু এ যে চোরের দায়ে ধরা পড়ে গেছি। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাই। নকুলই পরিচয় করিয়ে দেয়।

—আমার বন্ধু গজানন।

—গজানন! গুড! গজ মানে জানো? কতটা তার চাল বলো দিকি?

নিজের নামের মধ্যে এতো চাল লুকিয়ে ছিল জানতাম না। চাল তো এখন মহার্দামী বস্তু, এন্তার রুটি চিবুচ্ছি, চালের হদিস জেনে খুশী হই। বলি—চালের অনেক দাম। ও তো রেশন হয়ে গেছে।

গোলমামা দু চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে স্টীম ইঞ্জিনের মত ভোঁস করে একগাদা চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বলেন—ইডিয়ট! ও চাল না, দাবার চাল। জানো রাশিয়া সেকেন্ড ওয়ারে কি করে জিতলো?

বলি—আজ্ঞে দেশপ্রেম আর সাহস!

—নক্‌লো?

নক্‌লো পরীক্ষায় ভালো টুকলিফাই করতে পারে। তাই আমার লাইনেই জবাব দেয় নকল করে—দেশপ্রেম, সাহস আর রণকৌশল দিয়ে ওরা মাতৃভূমিকে রক্ষা করেছিল।

—সাট্ আপ! স্রেফ দাবা। দাবার চালে বাজী মাৎ করেছিল। সোজা কিস্তি। তাই বলি দাবাখেলা শেখ্, দেখবি অঙ্ক জল হয়ে গেছে। মগজে বুদ্ধি গিজ গিজ করবে।

ওটা যে আমাদের কিছুমাত্র নেই, সেটা ড্রইং মাস্টার মতিলালবাবু প্রায়ই ঘোষণা করেন। তাই বুদ্ধি কিছু পাবার আশায় বলি—দাবা খেললে বুদ্ধি হয়, না মামা?

মামা খুশী হয়ে বলেন—সিওর। ভালো দাবা খেলুড়ের মাথায় একটা পেরেক বসা দিকি?

চমকে উঠি ওই পেরেক মাথায় বসাবার নামে—কেন? মাথায় পেরেক বসালে খুনোখুনি হয়ে যাবে যে!

মামা শোনান—পেরেক আর থাকবে না, ওটা স্রেফ ইস্কুপ হয়ে যাবে বুদ্ধির চাপে!

চুপ করে থাকি। মামা আবার দাবার ছকে মন দিয়েছেন। সহসা বলেন—পৃথিবীতে এখন সেরা দাবা খেলোয়াড়ের নাম জানো? রাশিয়ার লোক তিনি। আমেরিকার কোন চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে খেলা হচ্ছে, দুজন দু মহাদেশে বসে, চাল যাচ্ছে রেডিও ফটোয়।

অবাক হয়ে শুনি মামার দাবার সম্বন্ধে খবরগুলো। মামাবাবু বলেন—দাবা নিয়ে এবার থিসিস লিখবো। লিখেছি অনেকখানি। তাই কলকাতায় এলাম—ওগুলো ছাপাতে হবে।

মামাবাবু কদিন এ বাড়ি এসেছেন। এরই মধ্যে নকুলের বাবা কাকারাও তাঁকে চিনে ফেলেছেন। হঠাৎ ওর ছোট কাকাকে দেখে হাঁক দেন মামাবাবু—ওহে গিরীন, হবে নাকি? গজেই কিস্তি করে দোব, এসো এক হাত।

আপিসে যাচ্ছি মুখুয্যেমশায়।—ওর ছোটকা যেন পালালো।

গোলমামা রায় দেন—কাওয়ার্ড, খেলবার সাহস নেই। আরে আপিস! কতো দিন আপিস গেলামই না, দাবার খেলোয়াড় জুটে গেল তো আপিস কি হে? আরে ও নলিন—

—দেরি হয়ে গেছে ভাই!

নকুলের বাবাও ওঁকে দেখে গা ঢাকা দিলেন, গোলমামা হতাশ হয়ে আবার নিজেই ছক সাজিয়ে বসলেন। এই ফাঁকে নকুলকে ইসারা করে বের করে আনলাম।

হাঁপিয়ে উঠেছি এতক্ষণ দাবুড়ের পাল্লায় পড়ে। নকুল বলে—মামাবাবু বলেছেন, একটা নতুন ব্যাট কিনে দেবেন। সেইসঙ্গে নতুন ডিউস্ বল।

ওর মামার সম্বন্ধে ভয় হয়ে গেছে। তাই বলি—ও দেবে ব্যাট কিনে?

অনেক দিনের আশা একটা ব্যাটের। একটা আছে আর একটা হলে পুরোপুরি টিম করতে পারি।—নকুল বলে—ওর অনেক টাকা রে!

জবাব দিই—কিন্তু দাবা রোগে ধরেছে যে! কাছে ভেড়া দায়।

তবু সেই নকুলই হঠাৎ একদিন দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির। দুপুরে সেদিন জ্যামিতি নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। সবই বৃত্ত হয়ে গেছে, অবশ্য অঙ্কের স্যার আমাকে বলে দুর্বৃত্ত, তবু জ্যামিতির কোন কিছুই মাথায় ঢুকছে না। এমন সময় নকুল ঢুকে জানায়—আজ জপিয়েছি মামাকে। বলেছেন নিউমার্কেটে গিয়ে ব্যাট কেনা হবে, বলও। তারপর এসে মোড়ের মনোরমা কেবিনে এক্তার খাওয়া। তোকেও নিয়ে যেতে বলেছে।

কথাটা বিশ্বাস করতে পারি না—ধ্যাৎ!

নকুল বলে—সহজে কি হয়েছে? রীতিমত দাবা খেলা শিখে ওর সঙ্গে খেলতে হয়েছে আর হারতে হয়েছে। তবে তো খুশী হয়ে এসব দিচ্ছে বুড়ো। চল্, দেরী করলে আবার বিগড়ে যাবে।

পড়ে রইল জ্যামিতি। জামাটা গলিয়ে ইতি উতি করে বের হয়ে পড়লাম। আগে এসব লক্ষ্য করতাম না। কালীবাড়ির ওদিকে অশত্থ গাছের নীচে রাস্তার ধারে দিনরাত একদল লোক বসে থাকে—ওরাও দাবা খেলে দেখলাম। দাবা খেলার লোকজনের অভাব নেই। এক দল যায়, অন্য দল সেই ছকে এসে বসে পড়ে। ছক যেন চব্বিশ ঘণ্টা পাতা আছে। তাই দেখে নকুলকে বলি—কি রে নক্‌লো, তোর মামাবাবুকে এনে ভিড়িয়ে দিই!

জবাব দেয় নকুল—থাম দিকি। বুড়ো তাহলে ব্যাট, বল আর খাওয়ার কথা স্রেফ ভুলে যাবে। এখানে এসে নাকি তেমন জব্বর খেলুড়ে দেখতে পায়নি। তারই সন্ধান করছে। এদিকের খবর পেলেই সব ভেস্তে যাবে। চল্ শীগ্‌গীর। এতক্ষণ বোধহয় চেল্লাচ্ছে। সাহেব মানুষ তো, লেট হলেই ব্যস, ফায়ার!

ব্যাট, বল আর খাওয়ার টানেই চলেছি। ও পাশে বড় রাস্তার ধারে মনোরমা কেবিনের ঝকঝকে সাইন-বোর্ডটা দেখা যায়। ভিতরে টেবিল চেয়ার পাতা—ওদিকে কাঁচ বসানো পার্টিশান করা খুপরী। ওগুলো নাকি দামী খদ্দেরদের জন্যে।

আজ ওখানেই বসে যুৎ করে মুরগীর কাটলেট আর মটন চপ গেলা যাবে। বাতাসে খুসবু উঠছে। কয়েকজন কারিগর বোধহয় মোগলাই ভাজছে। জিবে জল আসে। শুধোই—হ্যাঁরে, মামাবাবু শেষকালে কিস্তি করে দেবে না তো? মানে, জুটবে তো এসব কিছু?

নকুল অভয় দেয়—মামাবাবুর এক বাত।

লোকটাকে যতো খারাপ মনে হয়েছিল প্রথমে, বোধ-হয় আসলে মামাবাবু তত খারাপ লোক নন। ট্যাক্সিতে করে সোজা চৌরঙ্গী গিয়ে ওবেরয়-এর দোকান থেকে একটা সোবার্স ব্যাট আর দুটো ডিউস্ বল এক দমকাতে কিনে দিলেন। ঠিক সত্যি কিনা ভাবতে পারি না।

মামাবাবু ব্যাটটা ধরিয়ে দিয়ে বলেন—নাও বয়েজ, ইট ইজ ইওরস্! তবে নক্‌লো, দাবাটা ছাড়িস না। দুঘণ্টা করে ডেলি খেলে যা, দেখবি অঙ্কতে নিদেন সত্তর পাবিই।

নকুল রামভক্ত গরুড়ের মত মাথা নাড়ে। আমিও বীর হনুমানের মত সায় দিই—তা সত্যি। সেদিন দেখলাম খুব ইন্‌টারেস্‌টিং খেলা।

মামাবাবু খুশী হয়ে বলেন—বুদ্ধি আছে তাহলে তোর।

চৌরঙ্গীর এদিক ওদিকে ঘুরছি, মামাবাবু কয়েকটা ইংরাজী বই কিনলেন, সবই দাবা খেলার বই। ও সম্বন্ধে যে এত দামী বই পাওয়া যায় এই কলকাতাতেই, তা জানা ছিল না। মামাবাবু যেন কি রাজ্য আবিষ্কার করেছেন। বললেন—বুঝলি, এসব বই মেলে না। বহু কষ্টে পাওয়া গেল। চল্ এইবার।

খিদেও লেগেছিল। তাছাড়া এতক্ষণ ধরে শুধু স্বপ্ন দেখেছি মনোরমা কেবিনের সেই কাটলেট আর মটন চপের। ব্যাট আর বল হাতাবার পর থেকে মনটা ওই দিকেই পড়ে ছিল। নকুল বলে—হ্যারিসন রোডের মোড়ে পাড়ার ওদিকে ভালো রেস্তোরা আছে মামা-বাবু, সেখানেই চলুন।

—অল রাইট! তাই চল্।

কার মুখ দেখে সকালে উঠেছিলাম, সেই কথাই ভাবছি। নইলে চকচকে দামী ব্যাট, দুটো ডিউস্ বল, তারপর এই রাজসিক খাওয়া। টেবিলে ঝকঝকে প্লেটে এসেছে লম্বা হাতের চেটোর সাইজের গরম কাটলেট, ওপাশে বেশ খানিকটা গ্রেভি দেওয়া মশলা মেশানো চপ, একটা পাত্রে স্যালাড। লাল টুকটুকে টম্যাটোর টুকরো-গুলো বিনসেন্ধ, গাজর আর বিটের বর্ণবাহারে হারিয়ে গেছে। তাতে মেশানো হয়েছে গোলমরিচ আর সোনালী রংয়ের মাস্টার্ড। টকমিষ্টি সস্ জমেছে তার চারিদিকে। ছুরি কাঁটা দিয়ে কেটে কেটে নরম সুসিদ্ধ মুরগীর মাংসটা টুকরো করে মুখে ফেলছি, মুখে দেবামাত্র মিলিয়ে যায়।

—চিংড়ির কাটলেট খাবি?

মামাবাবুর জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি। মাথা নাড়লাম সেই কারণেই।

হুকুম করা মাত্র বিরাট তিনটে গলদা চিংড়ি প্যান্ট কোট ছাড়ানো হয়ে কাটলেট রূপে এসে হাজির হল। সংগে আবার স্যালাড আলুসেদ্ধ সস্! ওপাশে রয়েছে প্লেট ভর্তি সেই সোনালী মশলামাখানো গরম মটন চপ্। অন্য প্লেটে হলুদ বিরিয়ানী আর মুরগির কারি।

মামার কিন্তু খাওয়ার দিকে মন নেই। নতুন কেনা দাবার বইটা পড়ছেন, মাঝে মাঝে নিজের মনেই কি সব বিড়বিড় করছেন ওই ছকগুলোর দিকে চেয়ে। মামা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আশপাশের টেবিলের অনেক খদ্দের খাওয়া ফেলে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে। টেবিল জোড়া প্লেট, দুজনে গোগ্রাসে গিলছি।

নকুল বলে—ও মামা, খান্।

—খাচ্ছি। আরে খাওয়াটাই সব হল? কি জব্বর চাল দেখেছিস? পাকা মাথা।

আমরা দুজনে খেতে থাকি। এ সুযোগ ছাড়ার মত বোকা আমরা নই। কাটলেট ছেড়ে চপ, তারপর ফাউল বিরিয়ানী—এ যেন নবাব সিরাজদ্দৌলার খানা, একেবারে নবাবী ব্যাপার! কোনদিকে চাইবার অবসর নেই। নকুল যতো গেলে, আমিও তার সংগে ততো তাল দিয়ে চলি।

হঠাৎ মাথা তুলে দেখি মামাবাবু নেই, ওর খাবার পড়ে আছে। বোধহয় চুরুট ফুরিয়েছে, কিনতে গেছেন। আমরা বাকী প্লেটটা সাবাড়ে চলেছি। তাও সাবাড় হয়ে গেল, কিন্তু মামাবাবুর তখনও পাত্তা নেই।

—কি হল রে নকুল তোর মামাবাবুর?

নকুল হাড় চুষতে চুষতে জবাব দেয়—গেছে বাইরে, আসবে এখুনি। তোর খাওয়া হয়ে গেল? তাহলে মামাবাবুর প্লেটটাও শেষ করে দিই। কি বলিস?

প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেল লোকটা গেছে, আর ফেরে নি। চেয়ে দেখি, ওর হাতের বইটাও নেই। নকুলো তখন কাটলেট-এর হাড় চিবুতে চিবুতে বলে—জিনিসগুলো কিন্তু ফাইন করে এরা।

—তা তো করে, কিন্তু তোর মামাবাবু করছে কি এখনও?

বেয়ারা একটা প্লেটে করে চাট্টি মশলা আর একটা বিল দিয়ে গেল। বিলে টাকার বহর দেখে চোখ কপালে ওঠে। তিনজনের বিল উঠেছে বত্রিশ টাকা, অথচ টাকা দেবার লোকটারই দেখা নেই। আমাদের পকেটে তো ছুঁচোয় ডন মারছে। নকুলো নির্বিকার। বলে—ভাবছিস কেন? মামাবাবু এল বলে।

এইবার ওরা খালি প্লেটগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল। এতক্ষণ তবু হাড় টেংরি এটা-ওটা চুষে সময় কাটানো যাচ্ছিল, তারও আর উপায় রইলো না। শুধু হাতে টেবিলে কাঁহাতক বসে থাকা যায়! লোকজন, অন্য খদ্দেররা আসছে। লোকের যে এত খিদে থাকে তা জানা ছিল না। এখানে সবাই আসছে আর এন্তার গিলছে, অন্য কোন কথাবার্তা নেই। আমাদের খালি টেবিলে বসে থাকতে দেখে যারা বসবার জায়গা পায়নি, তারা চেয়ে থাকে।

সন্ধ্যার মুখোমুখি সময় ঢুকেছিলাম, ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি পুরো দেড় ঘণ্টা কাবার হয়ে গেছে, প্রায় আটটা বাজে। মামাবাবুও গেছেন প্রায় ঘন্টাখানেক, আর দেখা নেই তাঁর।

অ্যাই খোকা তোমাদের বিলটা? জায়গা ছেড়ে দাও! বেয়ারা এইবার মুখ খোলে।

ওর দিকে চেয়ে বলি—মামাবাবু আসুন!

ওঃ, খেলে তোমরা, দাম দেবেন মামাবাবু? মামার বাড়ি পেয়েছো?—ততক্ষণ বেয়ারা নয়, খোদ ম্যানেজার কাম্ মালিক এসে উদয় হয়েছে। মোটা মুষকো লোকটা বলে—টেবিল ছাড়ো। চলো ওদিকে! দাম দেবেন মামাবাবু? অ্যাঁ! রসিকতা?

মামার সংগে রসিকতার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে জানি না। তাই বলবার চেষ্টা করি—কি রে নকুলো, মামাবাবু আমাদের আনেনি এখানে?

নকুলো জবাব দেয়—তাই তো!

—তিনি গেলেন কোথায়? যতো সব ধাপ্পাবাজ মিথ্যেবাদী বাঁদর ছেলে কোথাকার? গাল টিপলে দুধ বের হবে, এখন থেকে ধাপ্পাবাজি শিখেছো?

লোকজন জুটে যায়। আর পরামর্শ দেবার লোকের অভাব হয় না। কেউ বলে—পুলিসে দিন মশাই!

কে একজন বলে—পুলিস টুলিস কেন? আড়ং ধোলাই দিয়ে দিন আচ্ছাসে!

এতক্ষণে চেয়ার-টেবিলে বসিয়ে কতো খাতির করে খাওয়াচ্ছিল, এইবার ওরা আমাদের দুজনকে চোরের মত ধরে ফেলে দাবড়াচ্ছে। রাজা থেকে একেবারে ফকিরে পরিণত হয়ে গেছি আমরা, আর এর জন্য দায়ী ওই নকুলোর গোলমামা।

বলবার চেষ্টা করি—বিশ্বাস করুন, মামাবাবু সংগে করে আনলেন—

—আর গিল্লে তোমরা, তা সেই মামাটি কোথায়?

কে বলে ওঠে—তিনি চাঁদামামা হয়ে আপাততঃ আকাশে বিরাজ করছেন।

দাম দিয়ে দাও!—মোটা ম্যানেজার আমাদের দুজনকে মুরগি ধরার মত টিপে ধরে গর্জন করছে—ফেলো পয়সা!

চটে উঠি—দাম পাবেন, পরে দিয়ে যাবো। গায়ে হাত দেবেন না।

—ও! আবার তেজ আছে। মারবো এক থাবড়া, বদন বিগড়ে দোব।

ওর হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করতেই লোকটা সজোরে এক ধাক্কা দিল। প্রচণ্ড সেই ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে ওদের পার্টিশান-এর উপরই আছড়ে পড়লাম মাথা গুঁজে। চোখে সর্ষের ফুল দেখছি। মাথার উপরে বাহারের সেই কাঁচটা ওই প্রচণ্ড ধাক্কায় ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ে গেল। মালিক চোখের উপর ওই লোকসান দেখে হাতের কাছে নকলোকে পেয়ে ওকেই মৃদু একটা আছাড় মেরে বসলো। আর্তনাদ করছে নকলো, আমিও ছাড়া পেয়ে হাঁপাচ্ছি। কপালটায় প্রচণ্ড লেগেছে—তখনও মাথা ঝিম ঝিম করছে। নকলোকে মেজেতে পড়তে দেখে ভয়ে শিউরে উঠি। ওরা বোধহয় খুনের দল। যত্ন করে খাইয়ে এমনিভাবে দক্ষিণা দেবে জানলে এ মুখো হতাম না। আর গোলমামা জেনেশুনে জব্দ করবার জন্যই এদের খপ্পরে ফেলে দিয়ে নিজে পালিয়েছে।

মুষকো ম্যানেজার গজরাচ্ছে—দুটোকে ধরে রাখ্! ওদের টেংরি দিয়ে স্যুপ বানাবো, মাংস দিয়ে কাটলেট তৈরী হবে—

অর্থাৎ ওরা পয়লা নম্বরের নরখাদক জীব। লোকটা আমার হাত ধরে আবার ঘা কতক দেবার মতলব করছে, কে জানে বোধহয় কিমা বানিয়ে দেবে। আমিও এক ফাঁকে ওর ঠ্যাংয়ের তলা দিয়ে গলে স্যুৎ করে একেবারে দরজার কাছে তারপর সটান বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি এক লাফে। নকলোও তৈরী হয়ে ছিল, পড়ে রইল ষাট টাকার ব্যাট দশ টাকার ডিউস্ বল, পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে দুজনে বড় রাস্তা পার হয়ে গলির একটা নির্জন রকে বসে হাঁপাচ্ছি। নকলোর কথা বলার সামর্থ্য নেই।

ইশারায় সামনের কলের জল দেখিয়ে সে জানায়—জল খাবে। ধরে ধরে নিয়ে গেলাম কলে। দুজনে খানিকটা জল খেয়ে, মাথায় মুখে দিয়ে ধাতস্থ হলাম। নকলোর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, আছাড়ের ফলে ওর পা-টা চেয়ারের কোণায় লেগে ফুলে উঠেছে, টাটাচ্ছে। চোখে কপালে মারের দাগ, নাকটা যেন বেঁকে গেছে। আর আমিও বাঁ চোখটায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। চোখের উপরই সেই ধাক্কার ফলে একটি পরিমাণ মত আমড়ার আঁটি গজিয়ে উঠেছে, সেইটাই চাঁদের কলার মত বাড়ছে চড় চড় করে, চোখের সামনে এসে দৃষ্টিপথ আগলেছে। কানা ও খোঁড়া আমি।

রাত হয়ে গেছে। নকলোর মামার পাল্লায় পড়ে এই দশা হবে জানলে কে বের হতো আজ! নকলো তখন ফুঁসছে—মামার দফা শেষ করবো আজ, চল্।

দুজনে একটা রিক্সায় করে নকলোর বাড়ির দিকে এগোলাম।

ওদের বাড়িতে তখন খোঁজাখুঁজি পড়ে গেছে।

ওদের গোলমামা কলকাতায় বড় একটা আসেননি। তাছাড়া আজকাল তো এদিকে ওদিকে হাঙ্গামা লেগেই আছে। নকলোর কাকা-জেঠামশাই, বাবা ভাবছেন, মা তো ঘরবার করছেন। বাবা পুলিসে ফোন করার কথা বলছেন, ছোট্কা বের হয়েছে এদিক ওদিক খুঁজতে।

এমন সময় আমাদের ওই ভগ্নদূতের মত ধোলাই খেয়ে ফিরতে দেখে ওঁরা অবাক হন। নকলো ন্যাংচাচ্ছে আর আমি ঘাড় তুলে একশো কুড়ি ডিগ্রী অ্যাংগেল করে ওদের দিকে চেয়ে আছি। চোখের সামনের আমড়ার আঁটি তখন আট আনা সাইজের রাজভোগে পরিণত হয়ে চোখ ঢেকে ফেলেছে।

—কোথায় ছিলি?

নকুল জবাব দেয়—মনোরমা রেস্টুরেন্টে?

ওর জেঠমশাই শুধোন—রেস্তোরায় আজকাল কিল চড় ঘুসি, এসবও খাওয়ানো হয় নাকি? তা মুখুয্যে মশাই কোথায়? তোরা তো ফিরেছিস, তিনি কি এখনও এইসব খাচ্ছেন?

নকলো রাগে জ্বলে উঠেছে। বললে—আমাদের খাওয়াতে বসিয়ে তিনি কোথায় চলে গেলেন, আর ফেরেন নি। আর দোকানদার আমাদের নতুন ব্যাট বল কেড়ে নিয়ে দ্যাখো না কি হাল করেছে! আরও মারতো, আমরা পালিয়ে এসেছি।

ওর এক কাকা দুঁদে উকিল। মেজকাকা ডাক্তার। তাঁরা বলেন—এর ব্যবস্থা হবে। কালই কোর্টে ব্যাটাকে হাজির করাচ্ছি। এইভাবে মারবে। বাড়িতে খবর দিলেই তো পারতো!

জ্যাঠামশাই বলেন—সে পরে হবে, এখন দ্যাখ্, মুখুয্যেমশায় কোথায় গেল। নতুন লোক। এ কি কাণ্ড

দেখ দিকি ? থানায় খবর নে, দরকার হয় হাসপাতালে ফোন কর্। রাত দশটা বেজে গেল—এখনও ফিরল না !

কাণ্ডটা বোধহয় সেই সময়ই ঘটেছিল। মামাবাবু এসে জুটেছেন ওই কালীতলার মাঠে দাবার আসরে। রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে সিগার কিনতে এসে সন্টের বাবার পাল্লায় পড়েছিলেন। মামার হাতে ওই দাবার বই।

সন্টের বাবাও দাবাখেলোয়াড়। ওকে মাঝে মাঝে ওই কালীতলার সেই বটগাছের নীচে দেখেছি ওই দাবার দলে বসে থাকতে।

সন্টের বাবা গোলমামার হাতে দাবার বই দেখে পিছু নিয়েছিল ওর। আলাপ-পরিচয় হতেও দেরি হয় নি।

—বড়ে দিয়ে কিস্তি হয় মশাই ?

সন্টের বাবার কথায় ফোঁস করে ওঠেন গোলমামা সিগারের দোকানের সামনে—হয় না মানে ? আলবৎ হয় ? জেরোভস্কির বইয়ে রয়েছে।

সন্টের বাবাও ছাড়বার পাত্র নয়। সেও জবাব দেয়—রেখে দিন মশাই বই। বইয়ে লেখা থাকে, সদা সত্য কথা কহিবে। মিথ্যা কথা কেন বলছেন মশাই ? বড়ে দিয়ে কিস্তি ? হ্যাঁ!

কথায় কথা বাড়ে, জেদ বাড়ে। তারপরই সন্টের বাবা সোজা চ্যালেঞ্জ করে—চলুন না, দেখিয়ে দিতে পারবেন ?

গোলমামার সব গোলমাল হয়ে যায়। পড়ে রইল খাবার, পড়ে রইলাম আমরা সেই দোকানে,—গোলমামা ওই বড়ের মোক্ষম চাল দেখাবার জন্যই সন্টের বাবার সঙ্গে হনহনিয়ে চললেন কালীতলার বটগাছের নীচে দাবার আড্ডায়। বসে পড়লেন ধনুকভাঙ্গা পণ নিয়ে দাবার ছকে।

জোর খেলা জমে ওঠে। গোলমামাকে ওরা সকলে ঘিরে ধরেছে। মামাবাবু তখন চাল নিয়ে ব্যস্ত—একমাত্র ধ্যানজ্ঞান কি করে রাজাকে স্রেফ বড়ের চালে মাৎ করতে পারেন। গজ নৌকা মন্ত্রী নয়, স্রেফ বড়ে দিয়েই বাজীমাৎ করবেন তিনি। এত দিন পর কলকাতার তাবৎ খেলুড়েদের খেলা শেখাবেন। কোণঠাসা করে আনছেন তিনি রাজাকে, ওদিকে মনোরমা কেবিনের মালিকও তখন আমাদের কোণঠাসা করে ঠাসছে।

ব্যাপারটা কিন্তু যখন তুঙ্গে উঠেছে, তখনই কাণ্ডটা বাধে। গোলমামার লাল কোটটাই তার জন্য দায়ী। ওই সময় মাঠের ওই দিক দিয়ে একটা বিরাট ধর্মের ষাঁড় ভাঙ্গা গলায় গজরানি তুলে রোজ যাতায়াত করে মন্দিরের ফুলবেলপাতা খাবার জন্য। এইটাই তার রোজকার নিয়ম। আজ সেই ষাঁড় ওই জনতাকে পথ-রোধ করে বসে থাকতে দেখে বিরক্ত হয়ে বার কতক গর্জন করে ওঠে। খেলুড়েরা তখন খেলায় মত্ত।

ষাঁড়টাও এগিয়ে যায় ওই দিকে, ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে গাঁক্ গাঁক্ আওয়াজ করে। মামাবাবু তখন মাৎ করে এনেছেন, বীরদর্পে গর্জে ওঠেন—কিস্তি !

অর্থাৎ রাজা সামলাও এবার। ওই অতর্কিত হুঙ্কারে বৃষভপুঙ্গবও ভড়কে গিয়ে সামনেই লালকোট পরা মামাবাবুকে শিংয়ের এক প্রচণ্ড গোত্তায় আসমানে তুলে হাত দশেক দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে দুপা মাটিতে ঘসে শিংয়ে মাটি লাগিয়ে গর্জন করে উঠলো—ফোঁস—স্ !

নিমিষের মধ্যে জমাট আড্ডা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। গোলমামা পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছেন। আর দাপাচ্ছে ষণ্ড-পুঙ্গব চার পা তুলে—দাবার ছককে তছনছ করে।

ফোনটা বাজছে। নক্লোর বাড়ির ওরা খবর পান, গোলমামাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মনোরমা কেবিনের সেই গণ্ডগোলটার মীমাংসা হয়ে যায়। নক্লোর মামার কড়া আইনী চিঠির ধমকে মালিক নিজে এসে ব্যাট বল ফেরত দিয়ে দাম নিয়ে ক্ষমা চেয়ে গেল। আবার আদর করে বলে গেল—একদিন যেও খোকারা! সেদিন বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেল!

অবশ্য আর যাইনি ওদিকে, যদি আবার কোন কাণ্ড বাধে। নক্লো এখনও খুঁড়িয়ে হাঁটছে, এন্তার চুন হলুদ লাগাচ্ছে হাঁটুতে। আমার চোখের কাছে ফোলাটা এখনও রয়ে গেছে।

তবু মামাবাবুকে দেখতে হাসপাতালে গেছলাম। দেখি, পায়ে প্লাস্টার করে টেনে বেঁধে রেখেছে তাঁকে। ডাক্তার বললেন, বুড়ো হাড় তেমন জোড়া লাগবে না।

অর্থাৎ বাকী জীবনটা গোলমামাকে 'অ্যাংগেল' মেরেই চলতে হবে স্রেফ ওই দাবা খেলার জন্যই। অবশ্য মামা তবু হারেননি, বলেন—বুঝলি স্রেফ 'বড়ে'র চালে কিস্তি মাৎ করে দিয়েছিলাম আর একটু হলেই। সেরে উঠে তোদের দুজনকে ও খেলাটা শিখিয়ে যাবো।

আমি অবশ্য তারপর থেকে নক্লোর মামাকে এড়িয়ে চলেছি, সেই সঙ্গে দাবা খেলাকেও। খাবার চালের জন্য হাল বদলে গেছে, তার উপর দাবার চাল শিখে আর বেচাল হতে রাজী নই।

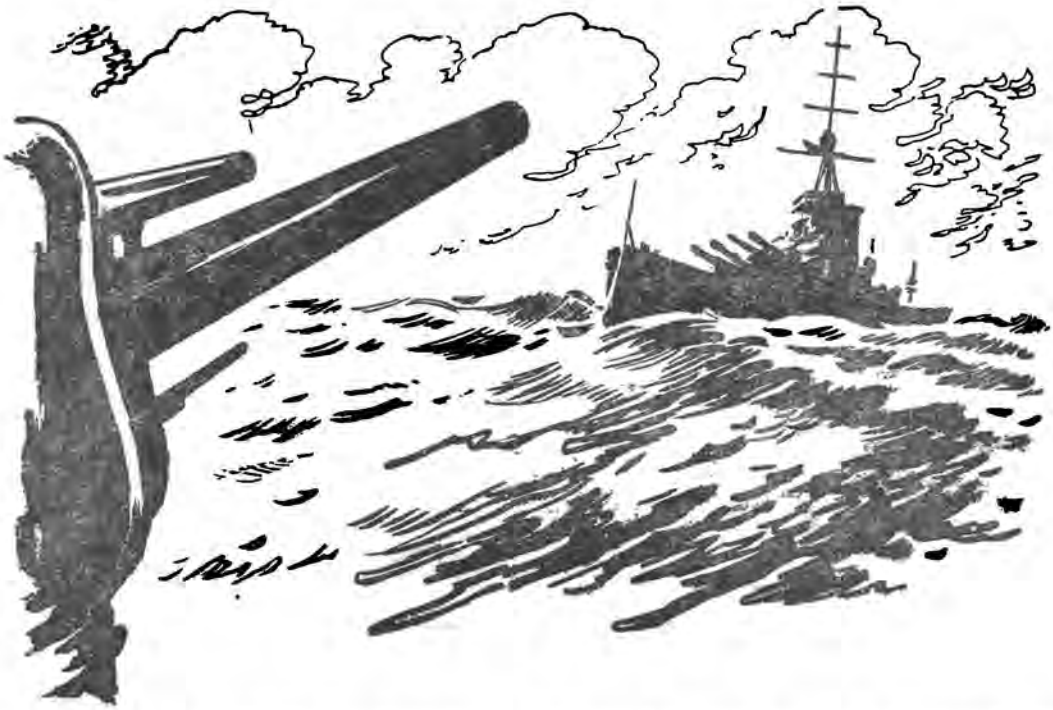

বোম্বেটে জাহাজ 'আটলান্টিস'

ইন্দুভূষণ দাস

[দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানি ছিল নাৎসী দলপতি ও ডিক্টেটার হিটলারের শাসনে। পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন ছিল হিটলারের আর তাঁর নাৎসী পার্টির বা ফ্যাসিস্ট দলের। আর তার ফলে কোটি কোটি নিরপরাধ মানুষের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর মাটি। সে নৃশংসতা ও বিভীষিকার বুঝি তুলনা নেই। সেই সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে জার্মান বোম্বেটে জাহাজ 'আটলান্টিস' যেভাবে বোম্বেটেগিরি চালিয়েছিল, তারই রোমাঞ্চকর সত্য ঘটনা বলা হয়েছে এখানে।]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যেই জার্মান বোম্বেটে জাহাজ এমনভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে যে, ইংরেজদের পণ্যবাহী এবং যাত্রীবাহী জাহাজগুলির পক্ষে নির্বিঘ্নে গন্তব্যপথে চলা রীতিমত কঠিন হয়ে পড়েছে। তাদের পক্ষে সব চেয়ে বেশী ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে জার্মান হানাদার জাহাজ 'আটলান্টিস'। সে যে কখন, কিভাবে, কোথা থেকে হঠাৎ উদয় হয়ে আক্রমণ চালাবে, তা বুঝতেই পারতো না ইংরেজদের জাহাজের ক্যাপ্টেনরা। তাই আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে চলবার সময় তারা সব সময় 'আটলান্টিস'-এর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো। দূরে কোন জাহাজের মাস্তুল দেখলেই তারা আঁতকে উঠতো, ঐ বুঝি এলো 'আটলান্টিস'!

ঐ সময়ের একটি ঘটনা। একদিন ব্রিটিশ পণ্যবাহী জাহাজ 'সিটি অব একজেটার' হঠাৎ দূরে একটা জাহাজের মাস্তুল দেখে সন্দিহান হয়ে ওঠে ঃ জার্মান বোম্বেটে জাহাজ নয় তো! কিন্তু আধঘণ্টা পরে জাহাজখানা কাছে এলে, 'সিটি অব একজেটার'-এর ক্যাপ্টেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কারণ সে জাহাজখানা হলো জাপানের সুপরিচিত পণ্যবাহী জাহাজ 'কাশিমারু'। জাপান তখনও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নি, অতএব তখনও সে নিরপেক্ষ দেশ বলে গণ্য।

'সিটি অব একজেটার'-এর ক্যাপ্টেন দূরবীনের সাহায্যে দেখলেন, জাহাজের জাপানী নাবিকরা যে যার কাজ করে চলেছে। শুধু তাই না। একজন জাপানী মহিলা ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। নিশ্চিন্ত

মনে তাঁর জাহাজ নিয়ে দূরে চলে গেলেন 'সিটি অব একজেটার'-এর ক্যাপ্টেন।

'সিটি অব একজেটার' দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যেতেই 'কাশি মারু' তার ছদ্মবেশ খুলে ফেললো। সেই জাপানী মহিলাও হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে গেলেন পুরুষরূপে। আসলে ওটি বিভীষিকা সৃষ্টিকারী বোম্বেটে জাহাজ 'আটলান্টিস' এবং ঐ স্ত্রীলোকবেশী মানুষটি 'আটলান্টিস'-এর ক্যাপ্টেন। কিন্তু তাদের ছদ্মবেশ এমনই নিখুঁত হয়েছিল যে, 'সিটি অব একজেটার'-এর ক্যাপ্টেনের মনে কোনরকম সন্দেহ জাগে নি।

বিচিত্র জাহাজ 'আটলান্টিস'। বিচিত্র তার ইতিহাস।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাহাজী কোম্পানী এবং সেই সব কোম্পানীর বিভিন্ন জাহাজের নামের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তারা সবাই জার্মানীর 'হানসা লাইন' এবং তাঁদের পণ্যবাহী জাহাজ 'গোল্ডেনমেল্‌স্'-এর নাম জানেন। এই জাহাজখানা বহুবার ইয়োরোপ থেকে পণ্যসম্ভার নিয়ে কলিকাতা বন্দরে এসেছে।

কিন্তু এই 'গোল্ডেনমেল্‌স্' একদা ভোল পালটে ফেললো, নিরীহ পণ্যবাহী জাহাজটি সহসা পরিণত হলো বোম্বেটে জাহাজে, আটলান্টিকের বুকে সৃষ্টি করলো বিভীষিকার রাজত্ব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে এই জাহাজখানাকে অস্ত্রসজ্জিত করে রেইডার বা হানাদার জাহাজে পরিণত করা হয়, নাম দেওয়া হল 'আটলান্টিস'। ছয়টি ছয়-ইঞ্চি কামান এবং অগুনতি ছোট কামান ও টর্পেডোতে সজ্জিত হয় 'আটলান্টিস', আর তখন থেকেই তার বোম্বেটেগিরির সূচনা। অল্প দিনের মধ্যেই 'আটলান্টিস' ইংরেজ এবং তার মিত্রপক্ষের ত্রাসের কারণ হয়ে ওঠে। পৃথিবীর নামকরা অপরাধীরা যেমন বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে অপরাধ অনুষ্ঠান করে, 'আটলান্টিস'-ও ঠিক সেইভাবে বিভিন্ন ছদ্মবেশে নিজের কাজ হাসিল করেছে। এমনই নিখুঁত হতো তার এই ছদ্মবেশ যে, অবলীলাক্রমে শত্রুপক্ষের জাহাজগুলির পাশ কাটিয়ে নির্ভয়ে চলাফেরা করতো সে, কারো মনে কোন রকম সন্দেহের উদয় হতো না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই 'আটলান্টিস' নিজের নাম ও প্রতীক-চিহ্ন পরিবর্তন করে ফেলতো। এবং এই কাজের জন্যে তার ডেকের এক কোণে মজুদ ছিল পৃথিবীর শত শত সুপরিচিত জাহাজের নামের ফলক এবং প্রতীক-পতাকা। শুধু ফলক ও প্রতীক-পতাকাই নয়, ছদ্মবেশকে নিখুঁত করবার জন্যে 'আটলান্টিস'-এর কর্মীদের মধ্যে ছিল একদল পেইন্টার। ক্যানভাস এবং প্লাইউডের ওপরে দ্রুতগতিতে তুলি বুলিয়ে অসাধ্যসাধন করতো এরা।

'আটলান্টিস'-এর কমান্ডার এবং পরিচালক ছিলেন ক্যাপ্টেন রোগ। এঁর ওপর কর্তৃপক্ষের হুকুম ছিল, বাংলায় যাকে বলা হয় 'উত্তমাশা অন্তরীপ' সেই কেপ্ অব গুড হোপ অভিমুখে ইংরেজের কোন জাহাজ যেন যেতে না পারে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে জাহাজকে ডুবিয়ে দিতে হবে। কর্তৃপক্ষের এই হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছিলেন ক্যাপ্টেন রোগ।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'আটলান্টিস'-এর বোম্বেটেগিরির সূচনা। সে তখন সোভিয়েট জাহাজের ছদ্মবেশে নরওয়ের উপকূল দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে যাত্রা করে। ২৩শে এপ্রিল তারিখে বিষুবরেখা অতিক্রম করবার পরেই সে সোভিয়েট পতাকা নামিয়ে ফেলে জাপানী পতাকা উত্তোলন করে। শুধু তাই নয়। নিজের চেহারা এবং নামও সে বদলে ফেলে। 'আটলান্টিস'-এর বদলে তার দেহের বিভিন্ন স্থানে যে নামটি শোভা পেতে থাকে তা হলো 'কাশি মারু'। এই 'কাশি মারু'-কেই দেখতে পেয়েছিলেন 'সিটি অব একজেটার'-এর ক্যাপ্টেন। 'আটলান্টিস' তখন কেবল কাজ শুরু করেছে, পণ্য ও যাত্রীবাহী জাহাজের উপর আক্রমণ শুরু করেনি। তাই তার আক্রমণ থেকে 'সিটি অব একজেটার' সেদিন রক্ষা পেয়েছিল।

'আটলান্টিস'-এর প্রথম শিকার হলো ব্রিটিশ জাহাজ 'সাইন্টিস্ট'। সিকি মাইল দূর থেকে কামান দেগে 'সাইন্টিস্ট'-কে ধ্বংস করা হয়। বলা বাহুল্য, এ কাজটিও সে করেছিল মিত্র দেশের জাহাজের ছদ্মবেশে। জাহাজখানা ধ্বংস করবার পর তার সাতাত্তরজন কর্মীকে বোটে করে নিয়ে এসে বন্দী করে রাখেন ক্যাপ্টেন রোগ।

দুই সপ্তাহ পরে 'আটলান্টিস' যখন জাপানী জাহাজের ছদ্মবেশে ভারত মহাসাগর দিয়ে চলেছিল, সেই সময় ক্যাপ্টেন রোগ ইংরেজ পক্ষের একটা বেতার-সংকেত শুনতে পান। বেতার-সংকেতে ব্রিটিশ জাহাজগুলিকে বলা হচ্ছিল, "সাবধান! একখানা জার্মান রেইডার জাপানী জাহাজের ছদ্মবেশে ভারত মহাসাগরের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

ক্যাপ্টেন রোগ দেখলেন, মহা বিপদ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। 'আটলান্টিস' দেখতে দেখতে নেদারল্যান্ড-এর জাহাজে রূপান্তরিত

হয়ে গেল। এইভাবে শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়লো 'আটলান্টিস'।

এর কয়েক দিন পরেই সে নরওয়ের 'তিরানা' জাহাজকে ধ্বংস করলো। সেই জাহাজখানা প্যালেস্টাইনের আমেরিকান সৈন্যদের জন্য খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে যাচ্ছিল।

এক মাস পরে আরও তিনখানা জাহাজ ধ্বংস করলো 'আটলান্টিস'। এর পর আরও পাঁচখানা। অর্থাৎ দু মাসের মধ্যে দশখানা জাহাজ ধ্বংস করার কৃতিত্ব অর্জন করলো 'আটলান্টিস'।

কিন্তু এর পরেই এক নূতন সমস্যা দেখা দিল। ব্রিটিশ 'অ্যাডমিরালটি' জারি করলো এক কড়া হুকুম। তাতে বলা হলো যে, কাছাকাছি কোন জাহাজ দেখতে পেলেই যেন সে-খবর রেডিও-যোগে অ্যাডমিরালটির কাছে পাঠান হয়।

ব্রিটিশ অ্যাডমিরালটির এই নতুন হুকুম জার্মান কর্তৃপক্ষের কানে যেতে দেরী হলো না। তখন 'আটলান্টিস'-এর ক্যাপ্টেনকে তাঁরা আদেশ দিলেন যে, ইংরেজ বা তার মিত্রপক্ষের কোন জাহাজ দেখলেই যেন নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করে তাকে ধ্বংস করা হয়।

ক্যাপ্টেন রোগও তাঁর কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চললেন। ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই আরও অনেকগুলো মিত্রপক্ষের জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেল 'আটলান্টিস'-এর অতর্কিত আক্রমণে।

জাহাজগুলি ধ্বংস করবার পর তাদের যাত্রী ও নাবিকদের তুলে এনে বন্দী করে রাখলেন ক্যাপ্টেন রোগ। কুড়ি মাসের বোম্বেটেগিরিতে এক হাজারেরও বেশী লোককে বন্দী করলেন তিনি। তবে এইসব বন্দীদের প্রতি ক্যাপ্টেন রোগ ভালই ব্যবহার করতেন। দিনের বেলায় তাদের ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াবার অধিকার দিয়েছিলেন তিনি।

অক্টোবর মাসে 'আটলান্টিস'-এর ধ্বংসের কারবারে বেশ একটু মন্দা যায়। এ মাসে মাত্র একখানা জাহাজ ধ্বংস করে সে। কিন্তু নভেম্বরে সে এই মন্দাকে সুদে আসলে পুষিয়ে নেয়। মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সে দুখানা জাহাজ ধ্বংস করে এবং আর একখানা বিনা যুদ্ধেই অধিকার করে।

এর পরেই শুরু হয় নতুন বছর অর্থাৎ ১৯৪১ সাল। এ বছর 'আটলান্টিস' বিশেষ সুবিধে করতে পারে না। তবে একেবারেই যে কিছু করতে পারে না তা নয়, আগস্ট মাস পর্যন্ত সে চারখানা জাহাজ ধ্বংস করে। এর পর আরও কয়েকখানা জাহাজ ধ্বংস করবার পর ১০ই সেপ্টেম্বর সে নরওয়ের 'সিলভাপনা' জাহাজটি অধিকার করে। এইটিই 'আটলান্টিস'-এর সর্বশেষ কাজ। এই জাহাজটি নিয়ে তার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত ও অধিকৃত জাহাজের সংখ্যা দাঁড়ায় বাইশটি। এখানে আরও একটি কথা বলে রাখা দরকার যে, 'আটলান্টিস'-এ যাদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল, জার্মান কর্তৃপক্ষ তাদের সবাইকে সরিয়ে নিয়ে যান অন্য জাহাজ পাঠিয়ে।

২১শে নভেম্বর তারিখে 'আটলান্টিস'-এর স্কাউট প্লেনটি হঠাৎ অকেজো হয়ে গেল। এদিকে 'আটলান্টিস'-এর তৈলাধার তখন প্রায় শূন্য অবস্থায় এসে গেছে। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় তৈল না পেলে 'আটলান্টিস' আর চলতেই পারবে না।

ক্যাপ্টেন রোগ-এর কাছ থেকে বেতারে এই খবরটা পেয়ে কর্তৃপক্ষ তখুনি একখানা 'ইউবোট' পাঠিয়ে দিলেন 'আটলান্টিস'কে প্রয়োজনীয় তৈল সরাবরাহ করবার জন্যে। পরদিন দুপুরের একটু পরে জার্মান 'ইউবোট ১২৬' এসে হাজির হলো এবং পাইপের সাহায্যে পাম্প করে 'আটলান্টিস'-এর তৈলাধারে তৈল সরবরাহ শুরু করলো।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় 'আটলান্টিস'-এর একটা ইঞ্জিন হঠাৎ অকেজো হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন রোগ তখন ইঞ্জিনটা খুলে নিয়ে মেরামত করতে নির্দেশ দিলেন। অবস্থা যখন এই রকম, ঠিক সেই সময় ক্যাপ্টেন রোগ হঠাৎ একখানা জাহাজের মাস্তুল দেখতে পেলেন। এর পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সম্পূর্ণ জাহাজখানা তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো। দূরবীনের সাহায্যে তিনি দেখতে পেলেন যে, জাহাজখানা হলো ব্রিটিশ ক্রুজার 'ডিভনশায়ার'। তিনি আরো লক্ষ্য করলেন যে, ক্রুজারখানা তাঁর জাহাজের দিকেই এগিয়ে আসছে। ঐ ক্রুজারের ক্যাপ্টেন ছিলেন আর. ডি. ওলিভার (পরে ইনি ভাইস অ্যাডমিরাল হন)।

'ডিভনশায়ার'-কে এগিয়ে আসতে দেখেই ইউবোট ডুব দিল। ফলে ইউবোট আর 'আটলান্টিস'-এর মধ্যে যে তেলের পাইপ যুক্ত ছিল সেটি গেল বিচ্ছিন্ন হয়ে। পাইপটি এইভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় জলের ওপরে তেলের একটা রেখা ফুটে উঠলো।

'আটলান্টিস'-এর অবস্থা তখন রীতিমত সঙ্গীন। তৈলাধারে পর্যাপ্ত তেল নেই, ইঞ্জিনটি মেরামত হয়নি, অথচ শত্রু-জাহাজ এসে পড়লো বলে। এখন একমাত্র

ভরসা হলো ইউবোটটি। সে যদি টর্পেডো মেরে 'ডিভনশায়ার'কে ঘায়েল করতে পারে, তবেই রক্ষে। নইলে আজই তার শেষ দিন।

এই কথা মনে হতেই তিনি চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। 'ডিভনশায়ার'-এর ক্যাপ্টেনকে তিনি রেডিওতে সংবাদ পাঠালেন যে, তাঁর জাহাজের নাম 'পলিফেমাস' এবং এটি মিত্রপক্ষের জাহাজ।

ক্যাপ্টেন ওলিভার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের কাছে রেডিওতে খবর পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, সত্যিই ওটি মিত্রপক্ষের জাহাজ 'পলিফেমাস' কি না।

এদিকে ক্যাপ্টেন রোগ আশা করছেন যে, ইউবোট টর্পেডো নিক্ষেপ করে 'ডিভনশায়ার'-কে ঘায়েল করবে। কিন্তু ইউবোট-এর ক্যাপ্টেন তখন 'আটলান্টিস'-এ থাকায় অন্যান্য কর্মীরা কর্তব্য স্থির করতে পারছিল না।

অবস্থা যখন এই রকম, সেই সময় ক্যাপ্টেন ওলিভার রেডিওতে সংবাদ পেলেন যে, ওটি 'পলিফেমাস' জাহাজ নয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন ওলিভার 'আটলান্টিস'কে লক্ষ্য করে কামান দাগতে শুরু করলেন।

শক্তিশালী ক্রুজারের আক্রমণে এক ঘন্টার মধ্যেই 'আটলান্টিস' ঘায়েল হয়ে ডুবতে শুরু করলো। ক্যাপ্টেন রোগ তখন তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে একটি মোটর চালিত ছোট বোটে উঠে দ্রুতবেগে পালিয়ে গেলেন। বাদ বাকি শখানেক কর্মী জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে লাগল।

এদিকে 'ডিভনশায়ার' তখন অনেক দূরে চলে গেছে। 'ডিভনশায়ার'-এর এইভাবে দ্রুত স্থান ত্যাগ সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন ওলিভার অ্যাডমিরালটির কাছে যে কৈফিয়ৎ দেন তাতে তিনি বলেন যে, 'আটলান্টিস'-এর কাছে একখানা জার্মান সাবমেরিনের উপস্থিতির জন্যে তিনি ঐ পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বেশী সময় ওখানে থাকলে সাবমেরিন থেকে টর্পেডো নিক্ষেপ করা হতো। সেই আক্রমণ থেকে জাহাজকে রক্ষা করবার জন্যেই তিনি তাড়াতাড়ি সরে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

'ডিভনশায়ার' সরে যাওয়ায় ইউবোটখানা আবার ভেসে উঠলো এবং 'আটলান্টিস'-এর নিমজ্জমান কর্মীদের উদ্ধার করে ব্রাজিল অভিমুখে যাত্রা করলো।

দুই দিন পরে জার্মান জাহাজ 'পাইথন' এসে 'আটলান্টিস'-এর কর্মীদের লাইফ বোট থেকে উদ্ধার করলো। কিন্তু কয়েক ঘন্টা পরেই ব্রিটিশ ক্রুজার 'ডরসেটশায়ার'-এর আক্রমণে 'পাইথন' গেল ধ্বংস হয়ে। 'আটলান্টিস'-এর কর্মীরা আর একবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এর পর একখানা জার্মান ও একখানা ইটালিয়ান সাবমেরিন তাদের উদ্ধার করে সেন্ট নাজারেতে পেঁাছে দিল। সেখান থেকে তারা বার্লিনে গিয়ে হাজির হলো ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের 'নিউইয়ার্সডে'-র কয়েক দিন পরে।

'আটলান্টিস'-এর বোম্বেটেগিরির কাহিনী এখানেই শেষ। কিন্তু কাহিনী শেষ হলেও 'আটলান্টিস' এবং তার ক্যাপ্টেন বেআইনী বোম্বেটেগিরির সাহায্যে সে-সময় যে ভাবে শত্রুপক্ষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল, গত মহাযুদ্ধের ইতিহাসে সে কাহিনী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

—বাদল বন্দ্যোপাধ্যায়

রকম রকম জানবার কথা

॥ দুই ॥

দৃষ্টিশক্তিকে স্বাভাবিক করে আনতে চশমা আজ মানুষের পরম বন্ধু। ইতালী দেশে আবিষ্কৃত এই চশমার গঠন কিন্তু প্রথমাবস্থায় আধুনিক কালের মত ছিল না। প্রথম আবিষ্কৃত চশমাটি লাগানো ছিল একখণ্ড কাঠের ভেতর। সেটিকে হাতে তুলে নিয়ে তার কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখতে হত। ১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালী দেশের ফ্লোরেন্স সহরের এক মঠাধ্যক্ষ আলেকজান্ডার দ্য স্পিনা সর্বপ্রথম চশমা আবিষ্কার করার গৌরব অর্জন করেন। এ সম্পর্কে আরেকটি মত প্রচলিত আছে যে, ইতালীর ফ্লোরেন্সের অপর এক ব্যক্তি, যাঁর নাম সালভিনো আরমাটি—তিনিই নাকি ১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চশমা আবিষ্কার করেন।

আজকাল সিগারেট খায় না এমন মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু এই সিগারেটে কি আছে জানো? সিগারেটের কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেই দেখতে পাবে ভেতরে রয়েছে তামাক। এই তামাকের মধ্যেই রয়েছে তৈলাক্ত এবং বর্ণহীন একটি রাসায়নিক পদার্থ, যার নাম 'নিকোটিন'। এই 'নিকোটিন' জিনিষটা এমন বিষাক্ত যে, মানুষের শরীরে মাত্র বিশ (২০) মিলিগ্রাম ইন্‌জেকশন করে প্রবেশ করিয়ে দিলে সাময়িক পঙ্গুত্ব আসা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। নিকোটিন হার্টের গতি দ্রুততর করে, আর রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

মহান্ত জ্যাঠামশাইয়ের গল্প

শুভা কর

আজ তোমাদের কাছে একজনের কথা বলব। তিনি কোন বিখ্যাত ব্যক্তি নন, আমাদেরই মত সামান্য মানুষ। তবু কি জানি কেমন করে সেই সামান্য ব্যক্তিটি আমার মনের এক অসামান্য স্থান অধিকার করে আছেন। যাক্ এবার আসল কথায় আসি।

তিনি ছিলেন আমার দূরসম্পর্কীয় জ্যাঠামশাই। সেই গ্রামের আখড়ার মহান্তও ছিলেন তিনি। তাই আমরা তাঁকে ডাকতাম মহান্ত জ্যাঠামশাই বলে। তিনি যে কিরকম মানুষ ছিলেন, তাঁকে না দেখলে বুঝতে পারবে না। তবে একদিনের ঘটনা শোনাই তোমাদের।

মহান্ত জ্যাঠামশাই ছিলেন আখড়ার মহান্ত। তাই আখড়াতেই থাকতেন। তাঁর আখড়ার মধ্যেই প্রচুর ফলের বাগান ছিল। একদিন দুপুরে আমরা দল বেঁধে গেছি ফল চুরি করতে। গোটাকয়েক আম সবে হস্তগত হয়েছে, এমন সময় গর্জন শোনা গেল। আমরা তো পড়ি কি মরি করে ছুটছি। আর কানে ভেসে আসছে অমৃতধারা—পাজী, বদমাশ, চোর, নচ্ছার, হতভাগা ইত্যাদি। আরও কত বিশেষণ যে তিনি সেদিন আমাদের উপহার দিয়েছিলেন, আজ আর তা মনে নেই।

কিন্তু কি আশ্চর্য! আমরা যখন সবে নিজেদের আওতায় এসে হাঁপাচ্ছি, পেছনে দেখি মহান্ত জ্যাঠামশাই। সবাই তো পাথর! নড়বার শক্তি পর্যন্ত নেই। বুঝতে পারলাম, কপালে অশেষ দুঃখ আছে। কিন্তু এ কি! আমরা সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। উনি হাসছেন! ধীরে ধীরে জ্যাঠামশাই এগিয়ে এলেন। আর কি বললেন জানো? আমাদের তাড়া দিয়ে বললেন "চল্ চল্, সবাই আম খাবি চল্।"

আমরা নিথর।

"কিরে দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

একটু পরে অন্যেরা অবাক হয়ে দেখতে লাগল, যারা এক মিনিটও হয়নি গালাগাল খেয়েছে, তারাই আবার মহান্ত জ্যাঠামশাইয়ের আদর করে দেওয়া আম খাচ্ছে।

আর একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল। আমার বয়স তখন ছ বছর। মহান্ত জ্যাঠামশাই আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছেন। বিকেল হতে না হতে আমরা তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। একটা মিষ্টির দোকানের সামনে এসে উনি আমায় বললেন, "খাবি?"

আমি সম্মতি জানালাম।

ভেতরে ঢুকে জ্যাঠামশাই আমাকে দুটো রসগোল্লা দিতে বললেন। রসগোল্লার সাইজ দেখে চটে উঠলেন জ্যাঠামশাই। বললেন, "এই এতটুকু? কুলের বীচি নাকি হে?"

দোকানীও বিনয়ের অবতার হয়ে বলল, "আজ্ঞে, এই মাত্র তৈরী হয়েছে তো, রস ঢোকেনি বলে অতটুকু লাগছে। রসে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে।"

মহান্ত জ্যাঠামশাই আর কথা বললেন না। আমার খাওয়া হয়ে গেলে তিনি দাম জিজ্ঞাসা করলেন। দোকানী বলল, দু'আনা। জ্যাঠামশাই গম্ভীরভাবে দুটো আধ আনি বের করে দোকানীর হাতে দিলেন। সে তো থ। অবাক হয়ে বলল, "একি!"

মহান্ত জ্যাঠামশাই উত্তর দিলেন, "এখনও রস ঢোকে নি বলে ছোট আছে। দুটোকে রসে ডুবিয়ে রেখ, দুআনি হয়ে যাবে।"

তখন ছোট ছিলাম, কথাটা ভাল করে বুঝতেই পারিনি। এখন তাঁর সেই অদ্ভুত কীর্তির কথা মনে পড়ে আর নিজের মনে হাসি।

তোমাদের আরও একটা মজার ঘটনা বলি।

মহান্ত জ্যাঠামশাই কলকাতায় এসেছেন। আমরা তখন বড় হয়েছি। একদিন ঠিক হল, আমরা থিয়েটার দেখতে যাব। সন্ধ্যাবেলা, বাড়ী থেকে রওনা হব হব, এমন সময় জ্যাঠামশাই আমাকে বললেন, "একটা বাস ডেকে নিয়ে আয়।"

আমি তো অবাক ঃ "বাস ডাকব কি জ্যাঠামশাই, ও তো স্টপে গিয়ে উঠতে হবে?"

আমার কথায় উনি তো রেগে আগুন ঃ "বড় অবাধ্য হয়েছিস। যা বলছি শোন।"

শেষে অনেক করে বুঝিয়ে বাবা তাঁকে নিরস্ত করলেন।

আশা করি বুঝতে পারছ, মহান্ত জ্যাঠামশাই কি অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। এত নরম মন আমি কোন পুরুষের দেখিনি। কিন্তু এই জ্যাঠামশাইকেই একবার বিশ্রী একটা কলঙ্কে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

মহান্ত জ্যাঠামশাইয়ের একটা অভ্যাস ছিল অল্পতেই লোককে গালাগাল দেওয়া। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার তাকে কাছে টেনে নিতেন তিনি। গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাঁকে সুনজরে দেখত না। তারা বলত, গ্রামের আখড়ার মহান্ত উনি। ওঁর পক্ষে এরকম গালাগাল দেওয়া সাজে না। এ ছাড়াও তাদের অসন্তোষের প্রধান কারণ ছিল, মহান্ত জ্যাঠামশাই পুরোপুরি সন্ন্যাস-জীবন যাপন করতেন না। সিনেমা-থিয়েটারেও ছিল তাঁর অবাধ গতি।

সেই গ্রামের উকিল ছিলেন হরিশ চক্রবর্তী। কূট-বুদ্ধিতে সর্বাপেক্ষা পারদর্শী ব্যক্তি। ইনি একদিন আখড়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। রাত তখন বারোটা। হঠাৎ তাঁর কানে গেল নূপুর আওয়াজ। কে যেন নাচছে। উনি খুব অবাক হয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন। পরদিন রাত বারোটায় আবার তিনি আখড়ার পাশে এসে হাজির। আবার শুনতে পেলেন সেই সুন্দর ছন্দের সুর।

আখড়ার পাশে আরও একটা পুরনো বাড়ী ছিল। আগে সেটাই আখড়া ছিল, বাড়ীটা বেশী রকম ভেঙে পড়ায় ওখানে কেউ আর যায় না। হরিশবাবু সেই পোড়োবাড়ীর মধ্যে শুনতে পেলেন নূপুরের তাল। দুষ্টু লোকের মাথায় খারাপ বুদ্ধি আগে আসে। উনি পরের দিন সকালেই গ্রামে রটিয়ে দিলেন, মহান্তের স্বভাব খারাপ। রাতে বাইজী এনে নাচায়। বারুদের স্তূপে যেন আগুন পড়ল। গ্রামের লোক ঠিক করল, তাঁকে আর মহান্ত রাখা চলবে না। তারা মামলাও করল জ্যাঠামশাইয়ের নামে। সেই মামলা ভাগ্যবশতঃ উঠেছিল বর্ধমান কোর্টে। আমার কাকা সেই কোর্টের জজ।

নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত হল। কোর্টে লোক ভেঙে পড়েছে। যথারীতি জেরা শুরু হল। কিন্তু এ কি! গ্রামের লোকদের চোখে সর্ষেফুল। আমার কাকা মহান্ত জ্যাঠা-মশাইয়ের হয়ে রায় দিলেন যে, তাঁর এরকম স্বভাব হতেই পারে না। কাজেই হরিশবাবুরা হেরে গেলেন। কিন্তু নূপুরের শব্দের রহস্য তখনও আমাদের অজানা।

একদিন কাকা জ্যাঠামশাইকে জিজ্ঞেসই করে ফেললেন, "আচ্ছা দাদা, ওই নূপুরের আওয়াজ কি সত্যি?"

উত্তরে মহান্ত জ্যাঠামশাই যা বললেন, আমি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, "হ্যাঁ সত্যি। ওই যে পুরনো আখড়া আছে না, সেখানে ছোট্ট দুটো রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি আছে। আমি রোজ রাত্রে বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে নাচি।"

দুরন্ত ঈগল

দীননাথ কাশ্যপ

ধারাবাহিক উপন্যাস

॥ পূর্ব প্রকাশিতের পর ॥

॥ চার ॥

জুরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায়। পুরনো পাতা ও ফুলের তীব্র গন্ধ নাকে আসছে। সে বুক ভরে ঘ্রাণ নেয়। একটু আগেও খিদেয় ও ক্লান্তিতে পা চলছিল না। কিন্তু এখন সে পাথর থেকে পাথরে, তুষারের গাদা থেকে গাদায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। কোন ক্লান্তি নেই।

নাকে মুখে গাছের ডালপালার ঝাপটা লাগছে। সূর্য অস্ত যায় নি বটে, কিন্তু গাছপালার নীলাভ ছায়ার নীচে হিমেল ঠাণ্ডা। তুষার জমতে শুরু করেছে।

বাবু এগিয়ে গেছে। হঠাৎ দূর থেকে তার চিৎকার কানে এল। থেকে থেকে ডাকছে সে। জুরা দৌড়তে শুরু করে।

গাছপালা পাতলা হয়ে আসছে। শেষে জঙ্গলও শেষ হলো। জঙ্গলের গায়েই প্রকাণ্ড মোটা এক জুনিপার গাছ। হঠাৎ দুটো ভালুক বেরিয়ে এল সেখান থেকে। লাফাতে লাফাতে তারা পর্বত বেয়ে দ্রুত ওপরে উঠে গেল।

জুরার নজর পড়ে তৃতীয় আর একটা ভালুকের ওপর। সোজা হয়ে বসে সে বাবুর হামলা রোধ করছে।

বাবু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে বারবার। জুরাকে দেখে এ ভালুকটাও গর্জন করতে করতে ছুটে পালালো। আর সঙ্গে সঙ্গে লাঠির মতো কি একটা জিনিস ছিটকে পড়লো তার থাবা থেকে। অদূরে একখণ্ড পাথরের ওপর গিয়ে সেটা সজোরে পড়তেই তার গা থেকে আগুনের ফুলকি ঠিকরে উঠলো।

জুরা ছুটে যায় জিনিসটার দিকে। ম্যাচলক বন্দুকের দুমড়ানো নল একটা। নলটা তুলে নিয়ে সে-হায় হায় করে উঠলো, ধেয়ে গেল জুনিপার গাছটার দিকে।

সেখানে গিয়ে তার চক্ষুস্থির। গত বছর জুনিপার গাছটার গায়ে অনেক কষ্টে বড় এক ফোকর করে তার মধ্যে সে লুকিয়ে রেখে গেছলো বন্দুক দুটো—আজ তা লোপাট, তছনছ হয়ে গেছে! গাছের তলায় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে বন্দুক দুটোর দোমড়ানো ভাঙাচোরা অংশ আর শিকারের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম।

মাথায় হাত দিয়ে সে বসে পড়ে, বুঝতে পারে ব্যাপারটা। ক্ষুধার্ত ব্রাউন বা বাদামী ভালুকের দল শীতের ঘুম থেকে জেগে উঠে শিকারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে গাছের মধ্যে মানুষের গন্ধ পেতেই গর্ত ভেঙে বন্দুক দুটো টেনে বের করেছে। চর্বিমাখা চামড়া দিয়ে জড়ানো ছিল বন্দুক দুটো।

ক্ষোভে দুঃখে হতাশায় জুরা যেন বোবা হয়ে যায়। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে ভাঙা বন্দুকগুলোর দিকে। এখন উপায়? ভবিষ্যতের কথা মনে হতেই ফার-টুপির নীচে তার মাথার চুল আতঙ্কে ও দুর্ভাবনায় খাড়া হয়ে ওঠে। মাংস যোগাড়ের সব আশাই নির্মূল! বন্দুক নেই—কি দিয়ে সে শিকার করবে? অনাহারের হাত থেকে গাঁয়ের লোকদের বাঁচানো তো দূরের কথা, সে নিজে বাঁচবে কি খেয়ে?

ভাবতে ভাবতে চোখে তার জল এসে যায়। নিষ্ফল রাগে সে পাগলের মতো ছুটোছুটি শুরু করে। বন্দুকের ভাঙা নল দুটো এক-একবার কুড়িয়ে নেয়, নিয়েই ছুড়ে ফেলে দেয়, পরক্ষণে কুড়িয়ে নেয় আবার। নিজের উপরই রাগ হয় তার ঃ নীরেট গাধা, আস্ত নীরেট গাধা সে!

আবার সেই ভালুক—যাদের সঙ্গে প্রতি বছরই তাকে কঠিন লড়াই করতে হয়! তার স্থির বিশ্বাস, শিকারের এই এলাকা থেকে ভালুকরা তাকে তাড়াতে চায়। কিন্তু সে-ও বাপের বেটা—প্রাণ যায় সে-ও স্বীকার, হার সে মানবে না!

দুঃসহ রাগে হঠাৎ সে ছোরা টেনে বের করলো, তারপর পর্বত বেয়ে ওপর দিকে ধাওয়া করলো ভালুকদের পেছনে।

কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই,—হঠাৎ এ কী! শাঁ শাঁ শব্দে তার দিকে বড় এক পাথরের চাংড়া নেমে এল, তীরবেগে বেরিয়ে গেল তার মাথার ওপর দিয়ে। তারপরেই পর্বতের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করলো পাথরের পর পাথরের বড় বড় চাংড়া।

ব্যাপার কি? জুরা হতভম্ব। ভূমিকম্প? কিন্তু কই, পর্বতে তো কোন কাঁপাঝাঁপা নেই! পাথরগুলো একের পর এক বলের মতো গড়িয়ে নেমে আসছে। লঘু-পদে জুরা লাফিয়ে লাফিয়ে বারবার তাদের পাশ কাটিয়ে যায়। কখনো কখনো তার কানের পাশ দিয়েও পাথরের খণ্ড শোঁ শোঁ শব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে, সশব্দে নীচে খাতে গিয়ে পড়ছে। খাতে গভীর তুষারের পাঁক। খণ্ডগুলো পাঁকে তলিয়ে যাচ্ছে।

জুরা তখনো কিছু বুঝতে পারছে না। এমন সময় রীঝায়া হঠাৎ ছুটে এল। বিষম ভয় পেয়েছে সে। গুটিসুটি মেরে তাড়াতাড়ি সে জুরার দু পায়ের ফাঁকে গিয়ে ঢুকলো। রীঝায়ার কাণ্ড দেখে জুরা যেন আরো ক্ষেপে যায়। হতচ্ছাড়া নেড়ী কুত্তা! দারুণ রাগে তাকে সে লাথি মেরে দূরে ছুড়ে ফেললে। আর ঠিক তক্ষুণি ওপর থেকে প্রকাণ্ড এক পাথরের চাংড়া এসে পড়লো রীঝায়ার ওপর, তাকে পিষে গুঁড়িয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।

জুরা লাফিয়ে পাশের এক পাথর-ঢিবির ওপর উঠে পড়েছিল। এতক্ষণে ব্যাপারটা তার বোধগম্য হয়। ভালুকগুলোই ওপর থেকে তাকে তাক করে পাথরের চাংড়া ছুড়ে মারছে। সর্দারের কাছে সে শুনেছিল, ভালুকরা এইভাবেই পাহাড়ী বুনো ভেড়া শিকার করে। কিন্তু এ জাতীয় ঘটনার অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম।

রীঝায়ার মৃত্যুতে জুরার মেজাজ ঠাণ্ডা হয়। তখনো ওপর থেকে সমানে পাথর নেমে আসছে। সে-গুলো এড়িয়ে, বাবুকে ডেকে নিয়ে সে দ্রুত পায়ে নীচে নেমে জুনিপার গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

কিন্তু ভালুকগুলোর তা নজর এড়ায় না। এবার গাছ লক্ষ্য করে তারা পাথর ছুড়তে শুরু করে। বড় বড় চাংড়া গাছের গুঁড়ির ওপর এসে পড়ছে। গাছটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর তার মাথা থেকে ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে পাতলা তুষারের খণ্ড।

গাছের আড়ালে থেকে জুরা বন্দুক দুটোর ভাঙা

অংশগুলো এক জায়গায় জড়ো করে তার পাশে বসে পড়লো। রাগে, দুঃখে ও হতাশায় সে যেন মূক পাথর বনে গেছে। হঠাৎ এক সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে মনের কষ্টে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

পাশেই বাবু বসে আছে। মনিবের ব্যথাহত কণ্ঠ কানে যেতে সে-ও যেন কেঁদে উঠলো,—হা-উ-উ-উ—!

বিষণ্ণ সন্ধ্যা নামে বনানী পর্বতে। তার ছায়া দীর্ঘতর হয়। জুরার বিশ্বস্ত প্রিয়তম সঙ্গী বাবু মনিবের কষ্ট দেখে আর্তনাদ করে চলে একভাবে। ব্যথায় ভেজা সে কণ্ঠ।

॥ পাঁচ ॥

জুরার কাছ থেকে আলাদা হয়ে, কুচাক নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে চলেছে। প্রথম দিকে বেশ জোরেই হাঁটছিল। কিন্তু অন্ধকার যত ঘনিয়ে আসে, তার গতি ততই কমতে থাকে। দত্যিদানোর কথা মনে পড়তে গলা আপনা থেকেই যেন হাঁসের মতো সামনের দিকে লম্বা হয়ে যায়। পেছনে-বাঁকানো-ঠ্যাং পর্বতের সেই অশরীরী লোমশ মানুষদের সঙ্গে মুখোমুখী হওয়ার কথা ভাবাও যায় না! মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে সে নিজের ছায়াটা ভাল করে দেখে নেয়ঃ ছায়াটা কার? আমার তো! নাকি আর কোন ছায়া পেছনে আসছে?

তারপর গুহা আর পরিচিত গাছপালা নজরে পড়তেই সে যেন কতকটা স্বস্তি বোধ করলে।

আগুন জ্বালানোর জন্যে এবার সে ডালপালা ও বাকল কুড়োনোয় মন দেয়। কিন্তু হঠাৎ ও কী—একটা শব্দ না! বুক তার ধড়াস করে উঠলো। ডালপালা পড়ে গেল হাত থেকে।

শব্দটা আসছে গাছ থেকে। কী ওটা?

কিন্তু ওদিকে তাকাবে কে?

শেষে অনেক কষ্টে আড়চোখে সে তাকালো গাছটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো—আরে, আরে, একটা লক্ষ্মী পেঁচা না!

আনন্দে ডগমগ কুচাকঃ আর ভয় নেই। গাছে বসে আছে এক লক্ষ্মী পেঁচা। দত্যি-দানো-জিনদের হাত থেকে লক্ষ্মী পেঁচাই তো মানুষকে রক্ষা করে! এই বিজন অরণ্যে লক্ষ্মী পেঁচার মতো নির্ভরযোগ্য সঙ্গী ও রক্ষক আর কে আছে! খুশিতে কুচাক যেন উপচে পড়ে।

অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো সে লক্ষ্মী পেঁচার দিকে ফিরে এবার চোখ মটকায়। অবশ্য তার আগে ওকে সে কিঞ্চিৎ গালমন্দ করে নেয় তাকে ভয় দেখানোর জন্য।

পায়ের বাঁকানো ধারালো নখ দিয়ে লক্ষ্মী পেঁচা তখন ঠোঁট সাফ করছে। কুচাকের কাণ্ড দেখে সে বোধহয় তাজ্জব বনে গেছে। গোল গোল হলদে ড্যাব-ডেবে চোখে সে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

চটপট আবার শুকনো খড়কুটো ডালপালা কুড়িয়ে নিয়ে, গুহার মুখের সামনে এসেই দাঁড়িয়ে পড়লো কুচাক। ইহ্, ভেতরে কী অন্ধকার!

এক ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে সে জোরে হাঁক ছাড়ে,—গপ্‌গপ্ গপ্‌গপ্!

কিন্তু নাঃ, নীরব গুহা, কিছুই বেরোয় না সেখান থেকে। তবু ভেতরে যা অন্ধকার, বিশ্বাস নেই, কেউ হয়তো ঘাপ্‌টি মেরে থাকতে পারে।

কোমরবন্ধের ভাঁজ খুলে সে একটা পুঁটলি বের করলে—তেলচিটে একখণ্ড চামড়া দিয়ে মোড়া। চামড়ার ভাঁজ খুলতে ছোট একটা থলি বেরোলো। থলি থেকে বেরোলো একটা চকমকি, সোরার আরকে ভেজানো কিছু ছাগলের চুলের জ্বালানি আর একখণ্ড ইস্পাত। আগুন জ্বালাবার সরঞ্জাম।

কুচাক এবার বসে পড়ে বাঁ হাতে চকমকি ধরে বুড়ো আঙুল দিয়ে জ্বালানি চেপে ধরলো তার সঙ্গে। তারপর ইস্পাতের খণ্ডটা দিয়ে চকমকিতে ঘা মারতেই আগুনের ফুল্‌কি উঠলো। কিন্তু কি আপদ! জ্বালানিতে যে কিছুতেই আগুন ধরছে না!

হাড়কাঁপানো শীতের জন্যেই হোক বা ভয়ে আঙুল অসাড় হয়ে যাবার জন্যেই হোক, কুচাকের হাত কাঁপছে, আগুনের ফুল্‌কি ঠিক মতো জ্বালানিতে লাগছে না। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি। সামনে অন্ধকার গুহা। আতঙ্কে কুচাকের কি ছাই কোন দিকে তাকানোর উপায় আছে! তার দৃঢ় বিশ্বাস, গুহার অশরীরী ছায়ারা আগুনকে ভয় করে বলেই তাকে আগুন জ্বালতে দিচ্ছে না।

যাই হোক, অনেক কষ্টে জ্বালানি থেকে শেষ পর্যন্ত ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। সামনেই জড়ো-করা শুকনো ঘাসের আঁটির মধ্যে সেটা ঢুকিয়ে দিয়ে ফুঁ দিতেই আগুন জ্বলে উঠলো। জ্বলন্ত ঘাসের আঁটিটা কুচাক ছুড়ে দিলে গুহার মধ্যে। গুহাটা আলোকিত হয়ে উঠলো।

ধোঁয়ায় কালো নোংরা প্রকাণ্ড গুহা—এক শো কুড়ি ফুট উঁচু, নব্বুই ফুট চওড়া। ঘোড়াসমেত সেখানে এক-

শো লোকের জায়গা হতে পারে। শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রতি বছরই স্থানীয় শিকারীরা এখানে এসে আস্তানা গাড়ে।

কত রকমের বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারই না রয়েছে সেখানে! হাড়ের তৈরী বর্শাফলক, মরচে-পড়া তীরের ফলা, নানা জাতের জানোয়ারের হাড়গোড়, মানুষের মাথার খুলি—সব স্তূপাকার হয়ে আছে গুহার উঁচু দেয়াল ঘেঁষে।

শুকনো ঘাসপাতা ডালপালা কুচাক আগুনে ফেলে দেয়। সরু নীলাভ আগুনের শিখা হিস্‌হিস্‌ শব্দে জ্বলতে শুরু করে। মাথার খুলিগুলোর করাল চক্ষু-কোটর জ্বলজ্বল করতে থাকে, ঝকমক করতে থাকে তাদের সাদা দাঁতের পাটি। শুকনো কাঠকুটো চিড়বিড় করে পুড়ছে। হঠাৎ একসময় ফুল্‌কি ছড়িয়ে সে-গুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

জ্‌ঝাঃ! কুচাক হাঁফ ছাড়ে। কোথায় অন্ধকার আর

.....আড়চোখে সে তাকালো গাছটার দিকে।.....লক্ষ্মী পেঁচা না!

কোথায়ই বা সেই অপদেবতারা, এতক্ষণ যারা তাকে আধমরা করে রেখেছিল! সব হাওয়া!

গা-হাত-পা ভাল করে আগুনে সেঁকে সে ব্যাগে তুষার ভরে নিয়ে এল বাইরে থেকে। গুহায় ফিরে জ্বলন্ত একখানা কাঠ সে তুলে নেয় চুল্লী থেকে। এক কোণে এক ফাটলের মধ্যে সে কাঠখানা পুঁতে দেয়। তারপর শুরু হয় তার মন্ত্রপড়া। দূর অতীত থেকে চলে আসছে এই পবিত্র অনুষ্ঠান।

কাজ শেষ করে কুচাক স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

গুহার এক পাশে গাদা করা কতকগুলো পাথর। সেগুলো সরিয়ে ফেলতেই বড় একটা পাথরের ঢাকনি দেখা গেল। ঢাকনিটা তুলতেই গোপন এক গর্ত বেরিয়ে পড়লো। গর্ত থেকে কুচাক বের করলো বড় এক রান্নার কড়াই। বহুকাল আগে তার পূর্বপুরুষরাই ওটা নিয়ে এসেছিল এখানে।

কড়াইটাকে সে আগুনের ধারে নিয়ে এল। ধাতুর তৈরী নানা জিনিস, লোহার ফাঁদ ইত্যাদি হরেকরকম বস্তু তার মধ্যে। জিনিসগুলো সব বের করে সে কড়াইয়ের ধুলোবালি ময়লা মরচে সব সাফ করে ফেলে। তারপর সেটা চাপিয়ে দেয় আগুনের ওপর—তুষার গলিয়ে লপ্‌সি তৈরি করার জন্যে।

কাজ করতে করতে গুন গুন করে তার গানও চলেছে। অন্যের তৈরী গান তার পছন্দ নয়। নিজের তৈরী গানে সে সুর ভাঁজছে।

স্তূপীকৃত ধাতুর জিনিসপত্রগুলো তার বড় শখের গুপ্তধন। জুরাও জানে না এর খবর। জিনিসগুলো ভাল করে পরখ করে আবার সে গোপন জায়গায় রেখে দেয়, পাথরের বড় ঢাকনিটা বসিয়ে দেয় গর্তের মুখে।

ক্ষিদেয় পেট চন চন করছে। অথচ জুরার পাত্তা নেই। কি করছে ছোঁড়াটা?

আগামী কালই যে সে ভেড়ার মেটুলি খাচ্ছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই কুচাকের। কেনই বা থাকবে? জুরা হলো গিয়ে দুনিয়ার সেরা শিকারী, তার জুড়ি নেই! সুতরাং সন্দেহ থাকার কথা নয়। কুচাকের খট্‌কা শুধু এক জায়গায়—মেটুলি সে খাচ্ছে কখন? দিনের বেলায়, না সন্ধ্যেয়?

যাই হোক আগামী কালের শিকার সম্বন্ধে সে এতই নিশ্চিন্ত যে, অবশিষ্ট তিন মুঠো ময়দা ফুটন্ত জলের মধ্যে ফেলে দিয়ে সে আবার গান ধরলো,—আগামী কাল মেটুলি খাব চর্বি.....

আঁ...আঁ... ! কী ওটা ?—কুচাক আঁতকে উঠলো,—অ্যাঁ, বাবু না!

বাবু হঠাৎ তীরবেগে ভেতরে ঢুকে চিল্লাতে শুরু করেছে বেখাপ্পা বেয়াড়ার মতো।

গালাগাল করতে করতে একখানা ডাল কুচাক ছুড়ে মারলে বাবুর দিকে। পাজী হতচ্ছাড়া কুকুর! জানটা তার গেছলো আর কি?

কিন্তু কুচাকের দুশ্চিন্তা দেখা দেয় ঃ জুরার কি হলো? কোন দুর্ঘটনা ঘটলো না তো? এগিয়ে গিয়ে যে খোঁজ করবে, সে সম্ভাবনাও নেই। যা অন্ধকার! কুচাক ইষ্টদেবতার নামজপ শুরু করে।

জুরা এল অনেক পরে। কুচাক আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলো। সে এত খুশী যে, জুরার সঙ্গে যে বন্দুক নেই, তা লক্ষ্যই করে না।

জুরা অত্যধিক গম্ভীর—বিষণ্ণও বটে। আগুনের ধারে সে গুম মেরে বসে রইল। তাকে ঘিরে বাবুর চিৎকার লাফালাফি চলেছে। তার দিকে খানিক থুতু ফেলে কুচাক খেঁকিয়ে উঠলো ঃ দূর হ, হারামজাদা জানোয়ার!

জুরা শেষে মুখ খোলে। বললে,—বড় কঠিন অবস্থায় আমরা পড়েছি। সব কটা বন্দুকই ভালুকে ভেঙে ফেলেছে।

অ্যাঁ!—কুচাক আর্তনাদ করে উঠলো। এবার তার নজর পড়ে, জুরার সঙ্গে বন্দুক নেই। সে হায়হায় করে উঠলো,—সব্বোনাশ সব্বোনাশ! জানোয়ারদের দেবতা তাহলে আমাদের মাংস দিতে নারাজ!

তা ছাড়া ভালুকেরা পাথর ছুড়ে রীঝায়াকেও মেরে ফেলেছে!—ক্ষুব্ধ অবসন্ন কণ্ঠে জুরা আবার বলে।

অ্যাঁ! কী! কি বলছো তুমি? রীঝায়াকে মেরে ফেলেছে!—হাউমাউ করে কুচাক কেঁকিয়ে উঠলো আবার।

অনেকক্ষণ কেটে যায়। কারো মুখে কথা নেই। নিস্তব্ধ গুহা, নিস্তব্ধ বন-পর্বত। অসহায় অবস্থা বুঝে বাবুও যেন নীরব হয়ে গেছে। পাতলা লপ্‌সি দুজনে শেষ করে নীরবে।

চামড়ায় ভাল করে মাথা জড়িয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে জুরা বললে,—বড্ড কঠিন অবস্থায় পড়তে হলো!

॥ ছয় ॥

আবার সেই উপোস। সময় কাটতে চায় না—ঘণ্টা-গুলো যেন অনন্তকাল ধরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে।

কড়াইতে অবিরাম জল ফুটছে। মাঝে মাঝে এক টিপ করে চা ওরা তাতে ফেলে দেয়। নিছক জলের বদলে তবু তো কিছু পেটে যাবে।

অধীর আগ্রহ নিয়ে বাবু অপেক্ষা করে, জুরা কখন শিকারে বেরোবে। গুহাময় সে ছুটোছুটি করে বেড়ায়, শোঁকে সব জায়গা, কিন্তু বন্দুক মেলে না কোথাও। শিকারে বেরোবার জন্যে অস্থির সে। শেষে একসময় সে ছুটে গেল সেই অলক্ষুণে জুনিপার গাছটার দিকে।

বসে বসে ওরা চা-মেশানো জল খাচ্ছে, এমন সময় কুচাক বললে,—দেখ!

বাবু একখণ্ড চামড়ার স্ট্র্যাপ কামড়ে ধরে বন্দুকের এক দুমড়ানো নল টানতে টানতে গুহায় নিয়ে আসছে। জুরার পায়ের কাছে ওটা রেখে সে তাকালো তার চোখের দিকে—মনিবের কাছ থেকে সে বাহবা পাবার আশা করছে।

রাগে জুরার চোখ জ্বলে উঠলো। ধমকে উঠলো,—এটা ভাঙা। কোন কাজে লাগবে না।

বাবু সরে গিয়ে ধীরে ধীরে গুহার মুখে গিয়ে বসলো। রোদ পোয়াতে পোয়াতে আড়চোখে সে দৃষ্টি রাখে মনিবের ওপর।

দুপুর বেলা। কুচাককে কিছু গুল্‌জান শুকোতে বলে লোহার ফাঁদ নিয়ে জুরা রওনা হলো ওপরে পর্বতের দিকে। হিমবাহের ওপর দিয়ে ভেড়া চলাচলের পথ গেছে, সেখানে ফাঁদ পাতবে সে ঃ বরাত জোরে যদি একটা ফাঁদে আটকা পড়ে!

কুচাক চললো গুল্‌জানের মোথা তুলতে। পর্বতের দক্ষিণ দিকের খাড়া ঢাল সূর্যের আলোয় নতুন করে গুল্‌জানে ভরে গেছে। হাতের ছোট কুড়ুলটার হাতল দিয়ে দুপাশের পাথরটিবিতে ঠুকঠাক ঘা মারতে মারতে কুচাক চলেছে। চারদিকে বড়োসড়ো কাঠবেড়ালী জাতের মারমটের দল। কুচাককে দেখেই তারা তীরবেগে গর্তে ঢুকে পড়ছে, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে ভয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তাকে।

পর্বতের ওপরে তুষারের আস্তরণ ভেদ করে সবুজের সমারোহ উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। উষ্ণ রোদে পাঁশুটে পর্বতগুলো গন্ধে ভরপুর। নীচে—বহু দূরে নীচে পার্বত্য জলা সব সবুজ আভায় ঝলমল করছে।

ঢিবি ও টিলার ফাঁকে ফাঁকে কাঁকুরে জমিতে গুল্‌-জান জন্মেছে। পনেরোটা মোথা তুলে কুচাক ধুয়ে শুকিয়ে ফেললে। এবার সেগুলো কাটতে হবে। ক্ষোভে দুঃখে ছোরাটা সে টেনে বের করে, শোঁকে কয়েক-বার। গুল্‌জানের এমনি অস্বাভাবিক দুর্গন্ধ যে, সেটা

দূর করা চাট্টিখানি কথা নয়। গাঁ ছেড়ে আসার আগে অনেক কষ্টে ছোরাটা সে গন্ধমুক্ত করেছিল। আবার তা নোংরা করতে হবে! মনের কষ্টে সে ভাবতে বসলো।

পর্বতের ওপর দিয়ে নীচু হয়ে ঈগল উড়ছে। চক-চক করছে তাদের পাখার নীচেকার সাদা পালকের রাশি। পাখার ঝাপ্‌টায় ছোট ছোট নুড়ি স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে নীচেয়।

কুচাক গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। কোন দিকে লক্ষ্য নেই। হঠাৎ কোটে টান পড়তেই ভয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো,—আরে আরে!

পরক্ষণে সে দেখে, বাবু তার কোটের কোণা কামড়ে ধরে টানছে, অর্থাৎ ডাকছে। নিরর্থক যে ডাকছে না, তাতে সন্দেহ নেই। ছোরাটা খাপে ভরতে ভরতে কুচাক একলাফে উঠে দাঁড়ালো। ছুটলো বাবুর পেছনে।

বাবু আগে আগে ছুটছে, মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াচ্ছে. আর ডাকছে তাকে লক্ষ্য করে। আনন্দে ও উত্তেজনায় ফোঁস ফোঁস করছে কুচাক। বাবুরও যেন তর সইছে না!

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই কুচাকের পা দুটো যেন আপনা থেকে থেমে যায় ঃ আচ্ছা, ব্যাপারটা যদি এক জ্যান্ত ভালুক হয়, তাহলে—?

বাবু কিন্তু সমানে ডেকে চলেছে। কুচাক শেষ-পর্যন্ত নিজেকে সান্ত্বনা দেয়,—নাঃ, খোশমেজাজেই বাবু ডাকছে!

সাহসে ভর করে সে এক টিলার ওপর গিয়ে উঠলো।

অদূরে পুরনো এক গলে-যাওয়া হিমানী-সম্প্রপাতের বাকী অংশে ছোট বড় পাথরের ঢিবি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। তারই একটার ওপর বসে আছে জুরা। একটা পা সে রেখেছে এক মরা পাহাড়ী ছাগলের ওপর। ছাগলটার বয়স বেশী নয়। আঙুল দিয়ে জুরা ছাগলটা দেখিয়ে দিলে।

নিঃশব্দে কুচাকও বুঝলো ব্যাপারটা। এগিয়ে গিয়ে অনেক কষ্টে একখণ্ড চামড়া সে ছাড়িয়ে নিলে ছাগলটার গা থেকে। পাথরের মতো শক্ত চামড়া। চামড়ার নীচে শুকনো মাংস। ছাগলটা বরফের নীচে রয়েছে বহু বছর।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুচাক সখেদে বললে,—উঁহু, হারাম! চলবে না।

ছোরাটা দিয়ে সে ছাগলের কণ্ঠনালিটা দেখিয়ে দেয়, সেটা হালাল করা নেই! মুসলমানী আইনের বিধান হলো, কণ্ঠনালি কেটে রক্ত বের করে দিয়ে জবাই করতে হবে, নয়তো সে মাংস খাওয়া গুনাহ।

জুরা কথা বলে না। নীরবে ছোরা বের করে ছাগলটা সে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললে। বাবু এটা আবিষ্কার করেছিল। তাই বকশিশ হিসাবে একটা খণ্ড সে ছুড়ে দিলে বাবুর দিকে। বাকী খণ্ডগুলো নিয়ে সে চললো ফাঁদে পাতার জন্যে। হিমবাহের ওপর দিয়ে ভেড়া চলাচলের যে পথ গেছে, সেখানকার দুটো ফাঁদ বাদে আর সব জায়গায় সে ফাঁদ পাতলো ঐসব মাংসের টুকরো দিয়ে।

কুচাক ফিরে চললো গুল্‌জানের মোথাগুলোর দিকে। পর্বত থেকে নামতে নামতে রাগে সে দাঁত কিড়-মিড় করে। পর্বতশ্রেণীর ঢালে ছাগল ও ভেড়ার পাল চরছে—এত কাছে, অথচ কত দূরে! গুল্‌জানের বিশ্রী দুর্গন্ধ নাকে আসে, বমি ঠেলে আসতে চায়। ছাগলটার মাংস না নেওয়ায় তার এখন আফসোস হচ্ছে। গুল্‌-জানের মোথাগুলোকে সে খাড়াইয়ের ওপর থেকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে। জুরা এলে বললে, গুল্‌জান এখনো শুকোয় নি, তাকে পিষে ময়দা করা চলবে না।

জুরা উচ্চবাচ্য করে না। শিকারী সে, মাংস খেতে অভ্যস্ত। গুল্‌জান সে-ও বরদাস্ত করতে পারে না।

খাওয়ার কিছু নেই। পরদিনও সেই অবস্থা। শুধু চা-মেশানো গরম জল। কুচাক ক্ষিদেয় অস্থির। নাচার অবস্থা। আবার কিছু গুল্‌জান তুলে সে শুকোতে দিলে।

তৃতীয় দিনে ফাঁদ পরীক্ষা করতে বেরিয়ে জুরা ফিরলো অল্পবয়সী একটা ঈগল বেঁধে নিয়ে।

ঈগলটাকে দেখে কুচাকের চোখ বিস্ফারিত। সর্বনাশ! ঈগল যে পবিত্র পাখি, তার মাংস খাওয়া হারাম! কিন্তু জুরা নীরব, নিঃশব্দে সে ছোরা বের করে। এত বড় কাফেরী কাণ্ড দেখাও গুনাহ—কুচাক তাই দুহাতে মুখ ঢাকে।

যখন সে চোখ মেললো, ঈগলের কণ্ঠনালি বেয়ে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। শেষপর্যন্ত কুচাক সিদ্ধান্তে এল, গুল্‌জান খাওয়ার চেয়ে জীবনে একবার—মাত্র একবার—ঈগলের নিষিদ্ধ মাংসের স্বাদ নিলে এমন কিছু অন্যায় হবে না।

অনেকক্ষণ ধরে ঈগলটাকে তারা সিদ্ধ করলো। তবু তার মাংস এত শক্ত যে, দাঁত বসানো দায়। [ক্রমশঃ]

ফাল্গুনে

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

অশোক-শাখায় মিষ্টি সুরে
গাইছে কোকিল ফাল্গুনী
রাঙলো পলাশ, রাঙলো শিমুল
স্বপ্ন-নেশার জাল বুনি।
মউল ফুলের মৌ ঝরে
মৌমাছিরা গুঞ্জরে
কৃষ্ণচূড়ার শাখায় নাচে
খঞ্জনা আর টুনটুনি॥
আবির খেলার দিন যে রে
বাজে খুশির বীন যে রে
কিসের নেশায় অনাগত
কোন্ পথিকের কাল গুণি!!
দখিন হাওয়া বইছে রে
কার বারতা কইছে রে
কোন্ বিবাগীর চরণ দুটির
নূপুর ধ্বনির তাল শুনি
আবার সে কোন্ যাদুকরের
ছোঁয়ায় যে গাই ফাল্গুনী!!

ইচ্ছে করে

তারকনাথ চৌধুরী

ইচ্ছে করে রকেট চেপে চাঁদের দেশে যাই,
ইচ্ছেমত ঘুরবো সেথা, পড়ার হুকুম নাই।
ইচ্ছে করে চড়ুই হয়ে জানলা দিয়ে উড়ি,
স্নেহশাসন বাঁধন ছিঁড়ে আপন মনে ঘুরি।
ইচ্ছে করে টিনের চালে বৃষ্টি হয়ে ঝরি
ঝম্‌ঝমা ঝম্ ঝম্‌ঝমা ঝম্ নূপুর নৃত্য করি।
ইচ্ছে করে ঢিলটি হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি জলে,
ঢেউয়ের সাথে ভাবটি জমাই আনন্দ-কল্লোলে।
ইচ্ছে করে জাহাজ হয়ে সাগর পাড়ি দিতে—
দূর অজানায় মিলিয়ে গিয়ে জানার খোঁজ নিতে।
ইচ্ছে করে ঘড়ির মত দিবস-রাতি জাগি,
টিক্‌টিক্ টিক্ টিক্‌টিক্ টিক্ শাসন সবার লাগি।
আরো কত ইচ্ছে যে হয় বলবো কত আর,
ঘুমের মাঝে আসে তারা মিছিল করে বার।

লিমেরিক

পরিতোষকুমার চন্দ

(১)

কিবা হোতো রোদের সময় হোতো যদি বৃষ্টি,
কালীঠাকুর ফরসা হোতো, দুর্গা কেলেকিষ্টি?
আম গাছেতে ফলতো যদি কালো কালো জাম
কিংবা যদি শ্যাম না হোয়ে নাম হোতো তার রাম?
নিশ্চয়ই রসাতলে যেতো না কো সৃষ্টি।

(২)

চোখ নেই তার নেইকো নাকের গর্ত,
তবু নাকি হুঙ্কারে তার কাঁপে স্বর্গমর্ত
বললে বলে লড়তে পারি
খেতে দিলে পেটটা ভরি
এক গণ্ডা গুণ্ডা হাতি, এটাই নাকি শর্ত।

(৩)

পেঁচা বলে, পেঁচানী রে চেঁচাস কেন মিছে?
পেঁচী বলে, কি করবো, কামড়ালো যে বিছে!
পেঁচা বলে, বাঘের নোখ
তার সঙ্গে ব্যাঙের চোখ
শিলে বেটে লাগিয়ে দেবো, আও হামারা পিছে।

(৪)

বলে গদা গিয়েছিনু মামাবাড়ী হুগলি,
দেখেছিনু সেখানেতে মাঠ ভর্তি গুগলি।
মাছ নেই তাই গুগলি সবাই খায়,
তাতে নাকি সক্কলেই গায়ে জোর পায়।
হরি বলে, তাই খেয়েই তো হপ্তাখানেক ভুগলি।

কিশোর ভারতীকে ঃ তোতোন

মৃদুল দাশগুপ্ত

কিশোর ভারতী তুমি খুব ভালো—খুব,
খুশির সাগরে আমি রোজ দিই ডুব।
গল্প-কবিতা-ছড়া
মজার ধাঁধায় গড়া—
কিশোর ভারতী লাগে খুব ভালো—খুব।
দুষ্টুমি ভুলে গিয়ে
কিশোর ভারতী নিয়ে—
খুশির সাগরে আমি রোজ দিই ডুব;
কিশোর ভারতী লাগে খুব ভালো—খুব।

নিঝুম রাতের ছড়া

গৌতম গোস্বামী

হুম্ হুম্ হুম্ হুম্
পাড়া, গ্রাম নিঝ্‌ঝুম্
ছায়া ছায়া রাত্রি।
ঝট্‌পট্ চারিদিকে—
ওড়ে পেঁচা, চাম্‌চিকে,
নিশাচর যাত্রী।

ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্
তারা জ্বলে টিম্ টিম্,
লাখো লাখো সঙ্গী।
ঝিঁঝিঁ পোকা ধরে গান,
ঝালাপালা হোলো কান,
বিদ্‌ঘুটে, জঙ্গী।

খাল্ বিলে ঝপ্ ঝপ্,
দাঁড় বায় ছপ্ ছপ্,
বুঝি মাঝি-মাল্লা!
মিট্‌মিটে জোনাকি,
রাত্রির সাথে কি!
দেবে নাকি পাল্লা?

কৈশোর

অশোক হালদার

চক্ষে স্বপ্ন-বিজুরী চমক চিত্তটি অনাহত,
অসম্ভবের সীমানা যখন সাধ্যের পদানত—
তখন সূর্য যে কটি বছর আনে উজ্জ্বল ভোর
কৈশোর কৈশোর।
হৃদয় যখন গোলাপের মত সৌরভে থাকে ভরা,
অতল গহনে অমূল্য যত মণি-মুকুতার ঘড়া—
দীপ্তিতে যার কাটে অমানিশা আর শর্বরী ঘোর—
কৈশোর কৈশোর।
বক্ষে গরজে প্রাণময়তার সফেন জলপ্রপাত,
বাহু দুটি যেন অমিতশক্তি জগন্নাথের হাত—
পদভারে জাগে পৃথিবী-পৃষ্ঠে উন্মাদ হুল্লোড়
কৈশোর কৈশোর।
হয়ত কখনো বেপথু, বেতাল, চঞ্চল, অস্থির,
হয়ত মানে না বন্ধন কোন সংসার-গ্রন্থির—
সহজেই বশ মিষ্ট বাক্যে—এই তার মন্তর
কৈশোর কৈশোর।
জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত অবনত ম্লান মুখ
তোমাদের হাতে দিয়ে গেল আজ মানব-প্রেমের ঐ চাবুক—
আনো দেখি সুখ, দেখাও চাবুক, চওড়া কাঁধের জোর—
কৈশোর কৈশোর।

মিথ্যে বলিনি দাদা

কালীনাথ দাশ চাকুলাদার

মিথ্যে বলিনি দাদা—
বড়ো সাধ হয় বেরুই দিগ্বিজয়ে
অশ্ব না থাক, ভাঙা সাইকেল নিয়ে,
বৃষ্টি এসেই সব যায় মাটি হয়ে,
আরে রামো রামো, রাস্তায় কি যে কাদা!
বিশ্বাস করো দাদা!
গরমের দিনে প্রাণ যবে আইঢাই,
হিমালয়-বুকে তখুনি ছুটতে চাই
এভারেস্ট চেপে তেনজিং হয়ে যাই
ঘামাচি ও ঘাম এ দুটোই হয় বাধা
মিথ্যে বলিনি দাদা!
মনে আশা ছিল হরেক রকম
বরাতের দোষে সকলি জখম
তাই কসে খেয়ে লুচি চম্‌চম্
সুর সাধি গা মা—পা ধা
সত্যি বলছি দাদা!
শীত এলে ভাবি এইবার যাওয়া যাক্
সাহারা গোবিতে দিয়ে আসি তিন পাক
বিষম ঠাণ্ডা করে দেয় নির্বাক
লেপের তলায় পড়ে থাকি হয়ে হাঁদা
কথাটাই শোন দাদা—
বসন্ত এসে সুড়সুড়ি দিলে গায়
রকেটের মত প্রাণটা ছুটতে চায়
ভাবি কি উপায়ে চাঁদটাতে যাওয়া যায়
ঝঞ্ঝাট বাধে নিয়ে শুধু বাঁধা ছাঁদা
কি আর করব দাদা!

আমি পেরেছি

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

যে গল্পটা তোমাদের বলতে চলেছি, সেটা আসলে মোটেই গল্প নয়, সত্য ঘটনা। গল্পটা পড়া শেষ হলে তোমাদের মনে হবে, এমনি ছোটখাটো দুঃসাহসিক কাজ তোমরাও ত করেছ,—তা নিয়ে কি গল্প লেখা যায় না? নিশ্চয় যায়। কলম পেন্সিল নিয়ে বসে গেলে খাসা এরকম গল্প তোমরাও লিখতে পারবে।

গল্প বা ঘটনা যাই বল, তা হল তোমাদেরই মত একটি ছেলেকে নিয়ে। ধর, কার্ল তার নাম।

ইংলণ্ডের উত্তরে খনি-অঞ্চলের এক আধা শহরে সে থাকত।

ছেলেবেলায় আমরা পরিচিতের বাইরে যা দেখি, তাতেই আমাদের বিস্ময় লাগে, তা-ই আমাদের ভাল লাগে। অপু যেমন তার দুর্গা দিদিকে নিয়ে কাশের বন পেরিয়ে ট্রেন দেখতে ছুটত, টেলিগ্রাফের পোস্টে কান দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনে বিস্ময়ে মুগ্ধ হত, কার্লও তেমনি শহরের অন্য ছেলেমেয়েদের দলের সঙ্গে মিলে তাকিয়ে থাকত মাথার উপর দিয়ে স্টীলের তার বেয়ে রাবিশ ভর্তি চলন্ত ঝুড়ির ছোটাছুটির দিকে। খনি থেকে আরম্ভ হয়ে নদীর কাছ বরাবর এসে মাথার ওপরের এই ইলেকট্রিক ট্রলির লাইন শেষ হয়েছে। খনির যত আবর্জনা ঝুড়িতে চাপিয়ে ফেলা হচ্ছে নদীর পাড়ে এক জায়গায়। সেই স্তূপ ছাড়িয়েও অনেক দূর নদী পর্যন্ত চলে গেছে লাইনটা।

বাড়ীর বাইরে যতটুকু সময় থাকার অনুমতি, তার সবটুকুই কার্ল দাঁড়িয়ে থাকে উঁচু থামটার পাশে। মাথার ওপর দিয়ে ঝুড়িগুলো অনবরত বিচিত্র আওয়াজ তুলে চলছে তো চলছেই। মাঝে মাঝে খনিতে ট্রলি-চালকের ডিউটি বদল হবার সময় হলে, ঝুড়িগুলো মাথার ওপর নিশ্চল হয়ে ঝোলে, তা না হলে ওগুলোর যেন চলার বিরাম নেই।

কার্ল একলাই নয়, ওর সঙ্গী-সাথীরাও খেলা সাঙ্গ করে জড়ো হয় সেখানে। মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হলে ওরা ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে থাকে মাথার ওপরে নীল আকাশের গায়ে লোহার তারের সঙ্গে লাগানো ঝুড়িগুলোর দিকে।

এমনি করেই চলছিল, হঠাৎ সেদিন ঘটে গেল এক অবাক কাণ্ড। একটা ছোট ছেলে থাম বেয়ে উঠে একটা ঝুড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। নীচের সবকটা বাচ্ছা ছেলের মুখগুলো ত বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে। বাবা, খুদে ছেলেটার কি সাহস! ঝুড়িটা ঝুলন্ত ছেলেটাকে নিয়ে চলল, আর ছেলেটা ঝুলে ঝুলে চলল সঙ্গে সঙ্গে।

অন্য ছেলেমেয়েগুলো কাঁদো-কাঁদো হয়ে ছুটল নীচের জমিতে ঃ 'ইস, বোকাটা পড়বে আর মরবে!'

ঝুড়ি এসে থামে জঞ্জালের স্তূপের কাছে। স্তূপের কাছে কয়লাখনির যে লোকটি ছিল, সে ধমকায় ছোট ছেলেটাকে। ছেলেটা টুপ করে লাফিয়ে পড়ে সঙ্গীদের কাছে ছুটে আসে।

আনন্দে ওর চোখ দুটো চকচক করছে ঃ 'কি রে

দেখলি ত! কেমন আমাকে দেখাচ্ছিল বল ত?'

—'হাঁরে ওপর থেকে কেমন দেখাচ্ছিল রে?'

—'তোদের ঠিক এই টুকুন টুকুন পুতুল বলে মনে হচ্ছিল আর দূরে নদীটা সূর্যের আলোয় কি সুন্দরই না চিকচিক করছিল!'

কার্লের বয়স তখন মাত্র আট। ছেলেটার কাণ্ড দেখে মনে মনে সে ঠিক করল, 'একদিন আমিও উঠব ওটার মাথায়। তারপর ঝুড়ি ধরে চলে যাব জঞ্জালের স্তূপের কাছে। আর সেখান থেকে দেখব সোনালী রোদে ঝকমকে নদীটাকে।'

বাড়ী ফেরার পথে কার্ল তার বন্ধু লিলিকে বলল চুপিচুপি, 'দেখিস, আমিও একদিন উঠব ওটায়।'

'দুস, তোর ভয় করবে না?'—লিলি বলে, 'তুই কত্তো ছোট!'

'না, ভয় করবে না।'—জোর দিয়ে কার্ল বলল।

সেদিন ছিল ছুটির দিন। তবু খনির কাজ চলছে। আর চলছে মাথার ওপর ট্রলিটাও। ওরা ন'দশজন ছেলে-মেয়ে জড়ো হয়েছে রোজকার মত।

লিলি হঠাৎ বলে উঠল বন্ধু কার্লকে, 'কই, আজকেই ওঠ না।'

কথাটা বলে লিলি হাসল, নিশ্চয় বন্ধু তার সাহস করবে না উঠতে, একটা না একটা অজুহাত দেবে। অন্য-সব ছেলেমেয়ে তাকায় কার্লের দিকে।

কার্ল প্রথমে থতমত খেয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণে তার মনে হয়, কাপুরুষের মত মাথা হেঁট করে থাকা চলে না।

সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আর পরক্ষণে উত্তেজনার মাথায় থাম বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। থামটা সূর্যের তাপে কি গরম হয়ে উঠেছে, তার ওপর এত কাঁপছে যে, ওঠাটাও কম শক্ত কাজ নয়! তবু হাতের নাগালে ঝুড়িটাকে পেয়ে কার্ল মরচেধরা কানাত ধরে ঝুলে পড়ল। তলায় বন্ধুরা ওর প্রশংসায় হাততালি দিচ্ছে। কিন্তু রীতিমত কষ্ট হচ্ছে ওর। তার উপর তলার দিকটার সঙ্গে হাঁটুটা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে কার্লকে বিব্রত করে তুলছে।

তবু ঝুড়িটা যখন ধীর গতিতে এগিয়ে চলে সামনের দিকে, আর নীচে তার বন্ধুবান্ধবদের সহর্ষ চিৎকার সে শুনতে পায়, তখন কি ভালোই না লাগে! এখনই ত সে জঞ্জালের স্তূপের কাছে পৌঁছে যাবে, তারপর নেমে আসবে মাটির নীচে।

হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় নদীর কথা। ওই ত দূরে দেখা যাচ্ছে নদীটা। একটা ষ্টীমার আকাশে কালো ধোঁয়া উড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, ও স্পষ্ট দেখতে পায়।

কিন্তু ঝুড়িটা ত স্তূপের কাছে থামল না। ওকে নিয়ে আরও এগিয়ে চলেছে। আরে, হঠাৎ যে ঝুড়িটা থেমে গেল! তবে কি ট্রলিচালকের ডিউটি বদল হল, না আজ ছুটি বলে খনির কাজও বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ!

ভয়ে কার্লের কচি মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। কি করে সে নামবে এত উঁচু থেকে নীচের জমিতে! ওর হাত দুটো আর আঁকড়ে রাখতে পারছে না ঝুড়িটাকে। কি বিশ্রী যন্ত্রণায় হাত দুটো ওর অসাড় হয়ে যাচ্ছে!

সবাই ছুটে আসে, এসেছে লিলিও।

'ঝুলে থাক কার্ল, জন গেছে খনিতে খবর দিতে, আবার লাইন চালু হবে।'—লিলি নীচে থেকে চেঁচাচ্ছে।

ভয়ে চোখ দুটো বুজে গেছে কার্লের। লিলির কথামত জন ছুটে গিয়ে আধ মাইল দূরে খনির অফিসে খবর দেওয়া পর্যন্ত ও কি ঝুলে থাকতে পারবে?

নীচেও অদ্ভুত ভয়-পাওয়া এক নিস্তব্ধতা। ওপরে কার্ল, আর নীচে কয়েকটি আতঙ্কিত ছেলেমেয়ে। লিলির চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে গেছে, 'আর একটু, আর একটু কার্ল।'

হঠাৎ সব কিছু অন্ধকার হয়ে মুছে যায় কার্লের চোখ থেকে। কার্ল পড়ে গেল নীচের পাথুরে জমিতে।

যখন আবার চোখ মেলল কার্ল, তখন দেখল সে শুয়ে আছে হাসপাতালের বিছানায়। নড়বার সাধ্য নেই, সর্বাঙ্গ প্লাস্টারে বন্দী। সবাই এসেছে কার্লকে দেখতে। সেদিন কার্লের মামণি ধরে আনল লিলিকেও। সন্ত্রস্ত অপরাধীর মত ছলছল চোখে লিলি এসে দাঁড়াল কার্লের বিছানার পাশে। লিলি ভাবছে, 'বেচারাকে যদি আমি উঠতে না বলতাম!'

শরীরে যন্ত্রণা হচ্ছে কার্লের, তবু লিলিকে দেখে সে হাসে, হঠাৎ বলে ওঠে, 'লিলি দেখলি ত, আমি পেরেছি!'

ছোট ছেলে কার্ল বড় হয়ে তার ছেলেবেলার এই দুঃসাহসিক কাজটুকুর কথা ভোলে নি কোনও দিন। বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক হয়েছে সে, বহু বিপদের মুখেও তাকে পড়তে হয়েছে, আর তখনই তার মনে হয়েছে তার জীবনের অমূল্য সেই স্মৃতিটুকু, 'আমি পেরেছি, আমি পেরেছি লিলি।' আর সঙ্গে সঙ্গে সাহসে বুক ওর ভরে উঠেছে।

[বিদেশী ছায়ায়]

পশুরাজের বিদ্রোহী প্রজা

ময়ূখ চৌধুরী

রাজতন্ত্রের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রবল প্রতাপশালী নরপতির রাজত্বেও একশ্রেণীর স্বাধীনচেতা মানুষ বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে ভয় পায় না। মহারাজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে মুখ বুজে মেনে নিয়ে রাজস্বের দাবীকে রাজার প্রাপ্য বলে স্বীকার করে না এই বিদ্রোহী প্রজার দল এবং রাজশক্তির প্রবল আক্রমণে যখন পৃথিবীর বুক হয় রক্ত-রঞ্জিত, তখনও ঐ ভয়ংকর মানুষগুলো মৃত্যুপণ করে শূন্যে উড়িয়ে দেয় বিদ্রোহের উদ্ধত পতাকা। অসি ও ভল্লের শাণিত আস্ফালন অথবা কামান-বন্দুকের অগ্নিবৃষ্টি কিছুতেই সেই উদ্যত ও উদ্ধত ধ্বজাকে মাটিতে নামিয়ে আনতে পারে না, বরং বিদ্রোহী প্রজাশক্তির তীব্র আক্রমণে একসময় মহারাজের মহিমা হয় ধূলায় লুন্ঠিত!

মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে পশুজগতের কিছু কিছু মিল আছে। উদাহরণস্বরূপ পশুরাজ সিংহের কথাই যদি ধরা যায়, তবে বলতে হয় যে, তার রাজ্যপাট খুব নিষ্কণ্টক নয়। এই প্রসঙ্গে অবশ্য ভারতবর্ষের গির অরণ্যের 'রাজ-পরিবারের' কথা ধর্তব্য নয়। কারণ সেখানে সিংহের সংখ্যা খুব কম, আর পশুরাজের রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞা করতে পারে এমন কোনও শক্তিশালী জানোয়ার সেখানে বাস করে না; বিশেষতঃ ভারতীয় বনরাজ্যের বিভীষিকা ডোরাদার বাঘ ঐ অরণ্যে অনুপস্থিত। অতএব ভারতীয় সিংহরা বেশ নির্বিঘ্নেই রাজত্ব করে এবং নিরীহ পশুদের ঘাড় ভেঙ্গে মনের সুখে মাংসের খাজনা আদায় করে দিন কাটায়।

আফ্রিকার সিংহ কিন্তু তার ভারতীয় জ্ঞাতি-ভাইদের মতো ভাগ্যবান নয়। নিজের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য তাকে দস্তুরমতো লড়াই করতে হয়। আফ্রিকার অরণ্যে অ্যান্টিলোপ, জেব্রা, জিরাফ, ন্যু প্রভৃতি যেসব তৃণভোজী জন্তু ঘুরে বেড়ায়, তারা সকলেই সিংহের খাদ্য-তালিকার অন্তর্গত। নিজের দেহ দিয়ে ক্ষুধার্ত রাজার আহার যোগাতে তারা কিন্তু মোটেই ইচ্ছুক নয়, তাই সঙ্গী-সাথীরা যখন সিংহের অতর্কিত আক্রমণে মৃত্যুবরণ করে, তখন এই সব জানোয়ার খুব চটপট পা চালিয়ে দূরে সরে যায়, কখনও রুখে দাঁড়িয়ে রাজার অপমান করে না। তৃণভোজী মাত্রেই যদি এমন রাজভক্ত প্রজা হত, তবে সিংহের বরাতে দুঃখ ছিল না। কিন্তু কয়েকটি উদ্ধত তৃণভোজী জানোয়ার পশুরাজকে বিনা প্রতিবাদে রক্তমাংসের খাজনা দিতে চায় না।

আফ্রিকার মহিষাসুর কেপ-বাফেলো, খড়্গধারী গণ্ডার এবং বিপুলবপু হস্তী সিংহকে রাজার প্রাপ্য সম্মান দিতে নিতান্তই নারাজ!

সচল পর্বতের মতো হস্তিযূথ যখন বনপথ ধরে এগিয়ে যায়, তখন স্বয়ং পশুরাজ সপরিবারে তাকে রাস্তা ছেড়ে দেয়।

একটু তর্জন-গর্জন সে করে বটে, তবে হাতিরা

তাতে মোটেই বিচলিত হয় না। রাজ-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলেও সিংহরা হস্তিযূথের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায় না, কারণ যুদ্ধের পরিণাম যে রাজ-পরিবারের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা সেখানে নেই।

গণ্ডারের সান্নিধ্যও সিংহ এড়িয়ে চলে। সুযোগ বুঝলে গণ্ডার-শাবকের উপর সে আক্রমণ চালায় বটে, তবে এই হত্যাকাণ্ড গণ্ডার-জননীর দৃষ্টিগোচর হলে সিংহের মৃত্যু অবধারিত। গণ্ডারের কঠিন বর্মের মতো দেহচর্ম ভেদ করে সিংহের নখদন্ত গভীর ও মারাত্মক ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু গণ্ডারের খড়্গ অনায়াসেই পশুরাজের দেহটিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারে। গণ্ডার, মহিষ প্রভৃতি তৃণভোজী পশুর আক্রমণে মাংসাশী পশুরাজের প্রাণ বিপন্ন হওয়ার ঘটনা নিতান্ত বিরল নয়। পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর পথ খোলা থাকলেও, আক্রান্ত হলে পশুরাজ রণে ভঙ্গ দেয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে তার নীতি, 'হয় মারো, নয় মরো!'

রাজকীয় বৈশিষ্ট্য সন্দেহ নেই!

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী থেকে এই ধরনের একটি ঘটনা তুলে দিচ্ছি।

বনের পথ ধরে ভ্রমণ করতে করতে জনৈক শিকারীর চোখে পড়ল, সরু বনপথের উপর তাঁর দিকে পিছন ফিরে বসে আছে একটি মস্তবড় কেশরধারী সিংহ*! একটু লক্ষ্য করে শিকারী দেখলেন, নিকটবর্তী অরণ্য ভেদ করে যে মহিষটি এগিয়ে আসছে, সিংহের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তারই দিকে। মহিষ এগিয়ে এসে সিংহের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং নাক দিয়ে ভোঁস ভোঁস শব্দ করে পশুরাজকে পথ ছেড়ে দিতে ইঙ্গিত করল। সিংহ পথ ছাড়ল না। বোধহয় সে ভাবল, রাজা যদি প্রজাকে রাস্তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, তবে আর রাজ-মর্যাদা রইল কোথায়? অতএব দাঁত খিঁচিয়ে সে মহিষকে দিল এক প্রচণ্ড ধমক!

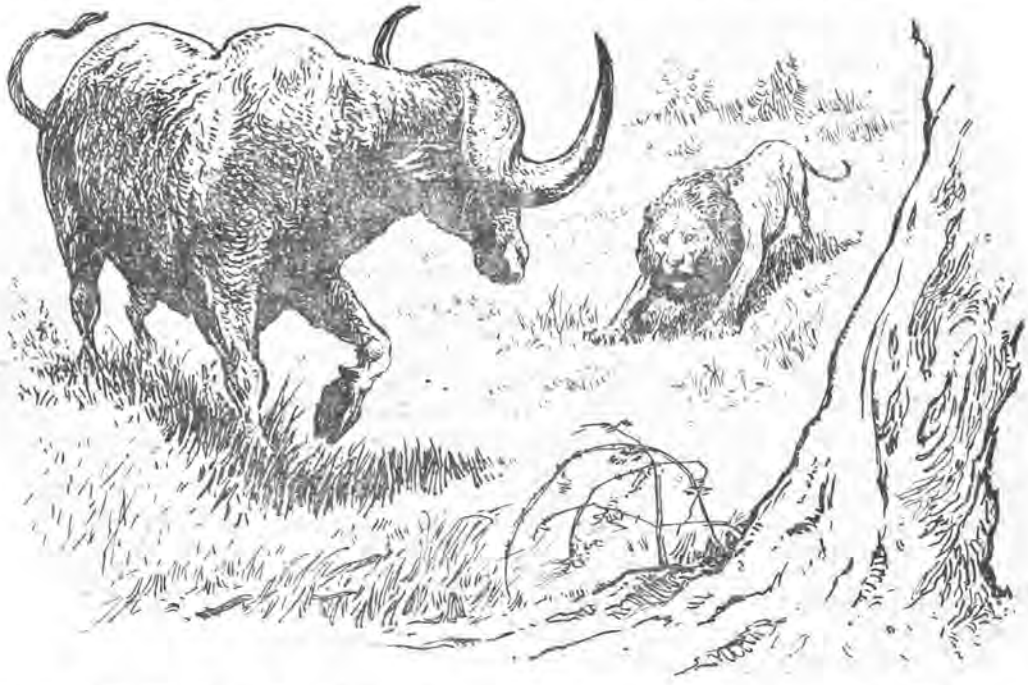

কোনও মাংসাশী শ্বাপদের ধমক-ধামকে ঘাবড়ে যাওয়ার পাত্র নয় আফ্রিকার কেপ-বাফেলো। সজোরে মাটিতে পা ঠুকে মহিষ জানিয়ে দিল, ভাল চাও তো সরে যাও।

সিংহ আবার গর্জে উঠল, মহিষও অচল অটল।

কিছুক্ষণ ধরে চলল একই দৃশ্যের অবতারণা।

কোনও পক্ষই পিছিয়ে যেতে রাজী নয়।

---

*কেশরধারী' বিশেষণটি ব্যবহার করলুম এইজন্য যে, সাধারণতঃ পুরুষজাতীয় সিংহের মাথায় কেশর থাকলেও প্রকৃতিদেবী কখনও কখনও সিংহকে কেশরের শোভা থেকে বঞ্চিত করেন। অবশ্য এই কেশরহীন সিংহের সংখ্যা খুব কম। আর আমরা জানি, সিংহীর মাথায় কখনই কেশর হয় না।

অবশেষে মহিষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, রুদ্রমূর্তি ধারণ করে সে ছুটে এল সিংহের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে—কী! তুচ্ছ তৃণভোজীর এত বড় স্পর্দ্ধা!! সিংহ সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল মহিষের উপর.....

তারপর কিছুক্ষণ ধরে চলল দাঁত আর নখের সঙ্গে শিংয়ের বোঝাপড়া.....অবশেষে আহত ও রক্তাক্ত দেহ নিয়ে পশুরাজ হল মৃত্যুশয্যায় লম্বমান, এবং বিজয়ী বীরের মতো সর্বাঙ্গে রক্তের আলপনা বহন করে রণ-স্থল ছেড়ে সগর্বে প্রস্থান করল মহিষ—আফ্রিকার ভয়ংকর কেপ-বাফেলো!

শিকারী ইচ্ছা করলে মহিষকে গুলি চালিয়ে হত্যা করতে পারতেন, কিন্তু সিংহজয়ী বীরকে গুলি করার প্রবৃত্তি তাঁর হয় নি।

এই লড়াইটা খাদ্য-খাদকের লড়াই নয়, এ লড়াই 'মানের লড়াই', 'ইজ্জতের লড়াই'!

বন্য পশুদের মধ্যেও আত্মসম্মানবোধ বিলক্ষণ জাগ্রত। তবে মানুষের মতো বিভিন্ন উপায়ে সম্মানবোধ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার সুযোগ তাদের নেই—তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাবোধ প্রমাণ করতে হয় শৃঙ্গ ও খুরের কঠিন প্রহারে, দন্ত ও নখরের মারাত্মক আলিঙ্গনে। অরণ্য-জগতে শক্তিই একমাত্র যুক্তি!

সম্পূর্ণ বিনা প্রয়োজনে শুধুমাত্র প্রাধান্য বিস্তারের জন্যও অনেক সময় যুদ্ধের অবতারণা হয়। বিখ্যাত শিকারী জে. হান্টার একদিন আফ্রিকার বনপথে একটি জলহস্তী ও গণ্ডারের মৃতদেহ দেখতে পান। জল-হস্তীর দেহে গণ্ডারের খড়্গ করেছে কয়েকটি বৃহৎ ও রক্তাক্ত ছিদ্রের সৃষ্টি এবং শত্রুর করাল দন্তের আঘাতে গণ্ডারের পৃষ্ঠদেশ হয়েছে ছিন্নভিন্ন!

দুটি জানোয়ারই তৃণভোজী, কাজেই প্রাণধারণের তাগিদে খাদ্য ও খাদকের লড়াই এটা নয়। কার শক্তি বেশী, বনপথে কার প্রাধান্য থাকবে, এই প্রশ্নের মীমাংসা করতেই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল।

অর্থাৎ বন্য পশুরাও অনেক সময় প্রাণের চাইতে মান রাখাটাই বেশী প্রয়োজন মনে করে। এই ঘটনার প্রসঙ্গে হান্টার সাহেব বলেছেন,.....সম্পূর্ণ অনর্থক দ্বন্দ্বযুদ্ধে দুজনে প্রাণ দিয়েছে বটে, কিন্তু এর সঙ্গে যে মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

হান্টার সাহেবের ঐ বিবরণীতে গণ্ডার ও জল-হস্তী ঘটিত সমাচার পাঠ করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, পশুরাজের যাবতীয় প্রজা খুব 'শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট' নয়। এমন সব বদমেজাজী প্রজা নিয়ে রাজত্ব করা কি সহজ কাজ?

জলবাসী সরীসৃপ কুম্ভীরের সঙ্গেও সিংহের সম্পর্ক খুব মধুর নয়। কুমীর সাধারণতঃ জলের ভিতর থেকে জলপানরত পশুকে আক্রমণ করে, তবে অনেক সময় শিকার না পেলে ক্ষুধার্ত সরীসৃপ জলাশয় বা নদীগর্ভ ত্যাগ করে জঙ্গলের মধ্যেও শিকারের খোঁজে হানা দেয়। জেব্রা, অ্যান্টিলোপ, নু প্রভৃতি জানোয়ার ডাঙ্গার উপর এমন অভাবনীয় বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকে না—ঘন ঘাস-ঝোপের ভিতর থেকে একটা গাছের গুঁড়ি যখন হঠাৎ একজোড়া দাঁতালো চোয়ালের ফাঁদে শিকারকে চেপে ধরে, তখন বেচারার উদ্ধার পাওয়ার সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হয়ে যায়। শিকারের দেহটাকে কঠিন দংশনে বন্দী করে কুমীর তখন ছুটতে থাকে তার আস্তানার দিকে। এবং একটু পরেই জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় শিকার ও শিকারী।

পশুরাজ নিজের এলাকার মধ্যে জলবাসী সরী-সৃপের এই গুণ্ডামি সহ্য করতে চায় না। তাই ডাঙ্গার উপর সিংহ ও কুমীরের 'শুভদৃষ্টি' ঘটলেই সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে।

উইলসন বি. মেনার্ড নামক জনৈক শিকারী আফ্রিকার জাম্বেসী নদীর তীরবর্তী অরণ্যে এই ধরনের এক যুদ্ধের পরিণাম স্বচক্ষে দর্শন করেন।

নদীগর্ভ থেকে অনেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে যেখানে লড়াই শুরু হয়েছিল, সাহেব যখন সেখানে পদার্পণ করেন, তখন সিংহ ও কুমীরের বোঝাপড়া শেষ হয়ে গেছে। এখানে প্রথম কে আক্রমণকারীর ভূমিকা নিয়েছিল বলা মুস্কিল, তবে কোন পক্ষই যে জয়লাভ করতে পারেনি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সিংহের নীচের পাটির চোয়াল আর বুকের কিছু অংশ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং নখদন্তের আপ্যায়নে কুমীরের সর্বাঙ্গ হয়েছিল ক্ষতবিক্ষত। দুই যোদ্ধার প্রাণহীন দেহ টান হয়ে পড়েছিল মাটির উপর!

তবে বনের রাজা ও জলের রাজার মধ্যে এই ধরনের সংঘর্ষ খুব কমই হয়। হস্তী, গণ্ডার ও মহিষের সঙ্গেও সিংহ সহজে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায় না। ঐ সব তৃণ-ভোজী পশু সিংহকে দেখলেই 'রণং দেহি' মূর্তি ধরে রুখে দাঁড়ায়, আর পশুরাজ অধিকাংশ সময়ে অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করে মান বাঁচিয়ে সরে পড়ে। হস্তী, গণ্ডার বা মহিষ গায়ে পড়ে লড়াই করতে চায় না। সিংহ নিরাপদ দূরত্বে সরে গেলেই তারা সন্তুষ্ট থাকে।

কিন্তু পশুরাজের রাজত্বে এমন একটি জীব আছে,

যাঁর সামনে থেকে পালিয়ে গিয়েও পশুরাজ নিস্তার পায় না। এই ভয়ংকর জীবটি হচ্ছে আফ্রিকার বন্য কুকুর।

সমগ্র অরণ্যের বুকে সন্ত্রাসের রাজত্ব ছড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় এই বুনো কুকুরের দল এবং হস্তী, গণ্ডার ও বন্য মহিষ ছাড়া সব জানোয়ারই এই সারমেয়-বাহিনীকে যমের মতো ভয় করে। অ্যান্টিলোপ, নু, জেব্রা প্রভৃতি পশু প্রায়ই বুনো কুকুরের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই কুকুরগুলো মাইলের পর মাইল অনায়াসে ছুটতে পারে, তাই অত্যন্ত দ্রুতগামী জন্তুও এই ভয়ংকর মৃত্যুদূতদের ফাঁকি দিতে পারে না।

লেপার্ডের মতো হিংস্র পশুও এই বুনো কুকুরের দলকে ভয় পায়। তবে শ্বাপদ-বাহিনীর আক্রমণে লেপার্ড বড় একটা বিপন্ন হয় না, কারণ চটপট গাছে উঠে সে অনায়াসেই কুকুরদের কলা দেখাতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বোধহয় বলা দরকার। বাংলা ভাষায় লেপার্ডকে চিতা বলা হয়, কিন্তু তা ভুল। বাংলায় লেপার্ডের কোনো প্রতিশব্দ আছে বলে জানি না। চেহারায় কতকটা মিল থাকলেও চিতা ও লেপার্ড, দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের জানোয়ার। চিতা একটু ভীরুস্বভাবের, লাজুকও বলা যেতে পারে। কিন্তু লেপার্ড ঠিক তার বিপরীত—উগ্র ভয়ংকর দুর্দান্ত।

পশুরাজ সিংহ লেপার্ডের ন্যায় বিড়ালজাতীয় পশু হলেও তার ফোঁটাকাটা জাতভাইয়ের মতো গাছে ওঠার বিদ্যাটাকে আয়ত্ত করতে পারে নি। তাই সারমেয়-বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলে, পলায়ন অথবা পাল্টা আক্রমণ ছাড়া সিংহের আত্মরক্ষার অন্য কোনও উপায় থাকে না। এই ধরনের একটি ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন বিখ্যাত শিকারী জে. হাণ্টার। তাঁর লিখিত বিবরণী থেকে উদ্ধার করে ঘটনাটা এখানে সংক্ষেপে বলা হলো।

সাঁজোয়া গাড়ি চালিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলের পথে ভ্রমণ করছিলেন হাণ্টার সাহেব, তাঁর সঙ্গী ছিলেন একজন ভারতীয় মহারাজা। আচম্বিতে তাঁদের চোখের সামনে ভেসে উঠল এক অদ্ভুত দৃশ্য।

বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়ে পলায়মান এক সিংহের পিছনে তাড়া করে ছুটছে একদল বুনো কুকুর!

দলটা বেশ বড়—কুড়ি অথবা আরও কিছু বেশী সংখ্যক কুকুর নিয়ে দলটা তৈরী হয়েছে। মিঃ হাণ্টার এবং মহারাজা গাড়ির ভিতর থেকেই সমস্ত ঘটনাটা দেখতে ইচ্ছুক হলেন। ধাবমান সিংহ ও সারমেয়-বাহিনীকে অনুসরণ করে গাড়ি কয়েক শ গজ এগিয়ে গেল এবং তারপরই আরোহীরা গাড়ি থামিয়ে দিলেন। কারণ অনুসরণ-পর্ব তখন শেষ হয়ে গেছে। পশুরাজ সিংহ এবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে!

দশটি কুকুর দল ছেড়ে এগিয়ে এসেছিল, অর্থাৎ সারমেয়-বাহিনীর তারাই হল প্রধান যোদ্ধা।

সিংহ একবার দিক পরিবর্তন করে বাঁচার চেষ্টা করল, কিন্তু অগ্রবর্তী ছয়টি কুকুর সিংহের পলায়নের পথ আটকে দাঁড়াল। পশুরাজের অবস্থা দেখে শিকারীরা বুঝলেন, মাইলের পর মাইল ছুটে সিংহ হাঁফিয়ে পড়েছে, তার আর ছুটোছুটির ক্ষমতা নেই।

কুকুরগুলো কিন্তু একটুও ক্লান্ত হয়নি। হিংস্র দন্ত বিস্তার করে তারা পশুরাজকে ঘিরে ফেলল। সিংহ বুঝল, পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো যাবে না। ভীষণ ক্রোধে সে একবার গর্জন করে উঠল, তারপর আশ্রয় গ্রহণ করল

একটা কাঁটা গাছের নীচে।

ক্রুদ্ধ সিংহের সেই ভয়াল সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তার দীর্ঘ লাঙ্গুল চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছে ভূমিপৃষ্ঠে এবং অধর-ওষ্ঠের ফাঁকে ফাঁকে আত্ম-প্রকাশ করছে তীক্ষ্ম দন্তের সারি।

কুকুরগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পাঁয়তারা করার পর পাঁচটা কুকুর একসঙ্গে সিংহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পশুরাজের প্রচণ্ড থাবা তৎক্ষণাৎ একটা কুকুরকে মৃত্যুশয্যায় শুইয়ে দিল, কিন্তু অপর চারটি কুকুর সিংহের পিছন দিক থেকে খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে পিছিয়ে এল নিরাপদ ব্যবধানে। গাড়ির ভিতর থেকে শিকারীরা সবিস্ময়ে দেখলেন, আক্রমণ-কারী চারটি কুকুরের রক্তমাখা চোয়ালের ফাঁকে ফাঁকে আটকে রয়েছে সিংহের রক্তাক্ত মাংসের টুকরো!

দলের অন্যান্য কুকুরগুলো এতক্ষণ ইতস্ততঃ করছিল। রক্তের গন্ধ পেয়ে এবার তারা ক্ষেপে গেল। সবাই একসঙ্গে আক্রমণ করল সিংহকে।

তবে এবার তারা অন্ধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েনি, দলের একটি কুকুরের মৃত্যু দেখে তারা সাবধান হয়েছিল। সিংহের মারাত্মক থাবা দুটির বিষয়ে সারমেয়-বাহিনী অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠল। এমন অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে শিকারের দেহে কামড় বসিয়ে তারা সরে আসতে লাগল যে, পশুরাজের পাল্টা আঘাত করার সমস্ত চেষ্টাই হয়ে গেল ব্যর্থ।

ক্রমাগত দংশনের পর দংশনে সিংহের দেহ রক্তাক্ত হয়ে উঠল। অবশেষে প্রায়-জীবন্ত অবস্থাতেই পশু-রাজের শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলল কুকুরগুলো।

বীভৎস দৃশ্য!

এমন ভয়ানক শত্রুর পাশাপাশি বাস করেও আফ্রিকার সিংহ যে তার প্রাধান্য ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে, তার অন্যতম কারণ, সে সামাজিক জীব—অন্যান্য বিড়ালজাতীয় পশুর মতো সে একা থাকতে ভালবাসে না, অধিকাংশ সময়েই সে দল বেঁধে থাকে।

সিংহের দলকে ইংরেজীতে বলে 'প্রাইড' (Pride of lions)। এক-একটি 'প্রাইড' বা দলের মধ্যে ছয় থেকে শুরু করে পনের-ষোলটি সিংহ ও সিংহী থাকে। দলবদ্ধ এই প্রাইডের উপর হামলা করার সাহস কুকুর-বাহিনীর নেই। অতগুলো সিংহের বিপজ্জনক সান্নিধ্য তুচ্ছ করার সামর্থ্য রাখে একমাত্র গজরাজ। অপর কোনও প্রাণী ঐ ধরনের দুঃসাহস প্রকাশ করলে রাজ-পরিবারের রোষে তার মৃত্যু অনিবার্য।

শ্বাপদ-গোষ্ঠীর মধ্যে বুনো কুকুরই সিংহের এক-মাত্র শত্রু নয়—কুকুরজাতীয় আর একটি জীব সিংহের উপর তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে। ঐ জীবটির নাম হায়না। কুকুরের মতো ক্ষিপ্র ও দ্রুতগতিসম্পন্ন নয় বলে হায়নার পক্ষে শিকার ধরা অত্যন্ত কঠিন। তাই অধিকাংশ সময়ে সে নিরাপদ দূরত্ব থেকে সিংহের উপর নজর রাখে এবং পশুরাজের শিকারপর্ব ও ভোজনপর্ব শেষ হলে ভুক্তাবশিষ্ট শিকারে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে।

হায়নার এই চৌর্যবৃত্তি সিংহ কিন্তু মোটেই পছন্দ করে না। খাওয়ার সময়ে কোনও অসহিষ্ণু হায়না যদি কাছে আসে, তাহলেই প্রচণ্ড চপেটাঘাতে পশুরাজ তার দেহ চূর্ণ করে দেয়।

কিন্তু ছোট ছোট এক ধরনের শেয়াল সিংহের ভোজে ভাগ বসালেও সে বিরক্ত হয় না, বরং অনেক সময় দেখা গেছে, উদার-হৃদয় সম্রাটের মতোই সে ঐ শৃগালদের প্রসাদ বিতরণ করছে!

হায়নারা সিংহের উদ্ধত ভাবভঙ্গী ও গাম্ভীর্য পছন্দ করে না। হায়নার চোয়ালের জোর সিংহের চেয়ে বেশী এবং পশুরাজের উপর তার আক্রোশও প্রচুর। তবু উদ্যত বজ্রের মতো দু-দুটো থাবার চপেটাঘাত এড়িয়ে রাজার দেহে দাঁতের ধার পরখ করার মতো সাহস বা ক্ষিপ্রতা হায়নার নেই। সুস্থ ও সবল সিংহকে হায়না তাই কখনও আক্রমণ করে না।

কিন্তু শিকারীর গুলিতে বা নিগ্রোদের বর্শার খোঁচায় সিংহ যদি খুব বেশী আহত হয়, তবে আর হায়নার কবল থেকে তার নিস্তার নেই। ঘন ঘাস-ঝোপের ভিতর লুকিয়ে সিংহ শিকারীর চোখে ধুলো দিলেও হায়নার ক্ষুধার্ত দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে না। রক্তের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে হায়নার দল সিংহকে খুঁজে বার করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আহত ও অবসন্ন দেহ নিয়ে পশুরাজ হায়নার মিলিত আক্রমণ রোধ করতে পারে না। সিংহের সর্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে বীভৎস ভোজসভা বসিয়ে দেয় হায়নার দল!

এইরকম ভয়াবহ পরিস্থিতির ভিতর দিয়েই পশু-রাজকে রাজত্ব চালাতে হয়। এতগুলো উদ্ধত, দুর্বিনীত এবং কিছু কিছু ইতর ও হিংস্র প্রজাকে সামাল দিয়ে রাজত্ব বজায় রাখা দস্তুরমতো কঠিন।

তাই পশুরাজ যে এখনও এই অবস্থায় তার রাজ্য-পাট বজায় রেখে বংশবৃদ্ধি করছে, সেজন্য তাকে প্রশংসা করা উচিত।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ডমরু-চরিত অবলম্বনে • শিল্পী : শৈল চক্রবর্তী

॥ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ॥

লোকটা হামাগুড়ি মেরে এসে ধরল সেই লেজটা। তার সাহস দেখে আমিও অবাক।
তারপর করল কি — সেই গাছে লেজটা এক পাক জড়িয়ে টান মারতে লাগল।
বাঘ দেখে তার লেজে টান পড়ছে।
একি কাণ্ড! মানুষ খেয়ে খেয়ে বুড়ো হয়ে গেলুম কেউত কখনো আমার লেজে হাত দেয়নি!
শুধু হাত নয় — এ যে দেখি রীতিমত টান দিচ্ছে! দাঁড়াও বাপধন, জেনে রাখ আমি হচ্ছি সোঁদরবনের রয়্যাল টাইগার!
এই না ভেবে ব্যাঘ্রমহাশয় শিকার ফেলে তার লাঙ্গুল উদ্ধারে তৎপর হল।
কোন পাষণ্ড আমার লেজ ধরে টানে রে? বাপরে বাপ! এতো বেশ জোর দেখি—
চলবে

পরগাছা

অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য

গাছগাছড়া নিয়ে উপকথার শেষ নেই। পৃথিবীর এদেশে ওদেশে নানা ধরনের গাছ নিয়ে নানা ধরনের কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে। ছোট্ট গাছ যে পরগাছা—মানুষের অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধার মধ্যেই যে টিকিয়ে রেখেছে নিজের অস্তিত্ব, নিশীথ সূর্যের দেশ নরওয়েতে তাকে নিয়েই এক সুন্দর গল্প গড়ে উঠেছে। আজকে আমি সেই গল্পই পরিবেশন করতে চাই।

বহুকাল আগের কথা। তখন আমরা দূরে থাক—আমাদের বুড়ো সাদা দাড়িওয়ালা ঠাকুরদাদেরও নাম-গন্ধ শোনা যায় নি। এমন দিনে সেই আদ্যিকালে খুব ভালো একজন দেবতা ছিলেন। তাঁর নাম বালডার। তিনি ছিলেন শান্তির দেবতা। তাঁর বাবা ছিলেন ওডীন, মা ছিলেন ফ্রিগা।

বালডার ছিলেন হৃষ্টপুষ্ট, অথচ নিরীহ প্রকৃতির। এই গোবেচারা ছেলেটাকে নিয়ে দেবী ফ্রিগার ভাবনার অন্ত ছিল না। তাঁর সর্বক্ষণ ভয়—এই বুঝি তাঁর ছেলের কোন ক্ষতি হল।

শেষ পর্যন্ত তিনি প্রকৃতি রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দাকে ডেকে পাঠালেন। সবাই এল—গাছপালা, ছোট বড় প্রাণী, কেউ বাকী রইল না।

তিনি উপস্থিত প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে মিষ্টি কথা বলে, বালডারের কোন ক্ষতি না করতে অনুরোধ জানালেন। তাঁরা সবাই দেবীকে কথা দিলেন। কেবল মিস্‌টিলটো বা পরগাছাকে দেবী কোন অনুরোধ জানালেন না।

সে সময় লোকী ছিলেন দুর্ভাগ্যের দেবতা। তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত মন্দ—হিংসায় ভরা। কারো ভাল তিনি দেখতে পারতেন না। বালডারকে সবাই ভালবাসে, এটা তাঁর পক্ষে অসহ্য। কিভাবে বালডারের ক্ষতি করা যায়, তারই মতলব ঘোরে তাঁর মাথায়। কিন্তু পথ খুঁজে পান না।

লোকী ছিলেন ভয়ানক চালাক। তিনি এবার অন্য পথ ধরলেন। বালডারকে ধ্বংস করার উপায় তাঁকে যেভাবে হোক জানতে হবে ফ্রিগার কাছ থেকেই। তাই নানাভাবে ফ্রিগার মনোরঞ্জন করে তিনি তাঁর বিশ্বাস-ভাজন হয়ে উঠলেন।

একদিন বালডারের কথা উঠতে লোকী তাঁর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তারপর মিষ্টি কথায় দেবীর মন ভিজিয়ে বললেন—তাহলে দিদি, বালডারের জীবনের তো কোনরকম আশঙ্কাই নেই! কেউই তো ওর কোন ক্ষতি করতে পারবে না!

ফ্রিগা বললেন—তা ঠিক। তবু যা একটু ভয় ঐ মিস্‌টিলটোকে নিয়ে। তা ও তো নেহাতই ক্ষুদে জিনিস। ও আর কি এমন ক্ষতি করবে?

কথাটা শুনে আনন্দে নেচে উঠল দুষ্টু লোকীর মন। একথা সেকথার পর সে বিদায় নিল। তারপর পরগাছার একটা ডাল দিয়ে তৈরি করল সুন্দর এক বর্শা।

এবার লোকী বর্শাটা তুলে দিল বদরাগী যুদ্ধের দেবতা হোডারের হাতে। হোডার ঐ বর্শাটি ছুড়ে সহজেই বালডারকে মেরে ফেললেন।

বালডারের মৃত্যুতে ওডীন আর ফ্রিগার দুঃখের শেষ রইল না। শোকে দুঃখে তাঁরা ভেঙ্গে পড়লেন।

এদিকে বালডারের স্ত্রী নানা কেঁদে কেঁদে বিছানা ভিজিয়ে ফেললেন। এমনি সময় ঘটল সেই অদ্ভুত কাণ্ড। হঠাৎ তাঁর চোখের জল গিয়ে পড়ল পরগাছার শিকড়ের উপর। সঙ্গে সঙ্গে শিকড়গুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এরপর থেকে পরগাছার শিকড় আর মাটি পর্যন্ত পৌঁছয় না। বালডার অবশ্য দেবতাদের অনুগ্রহে প্রাণ ফিরে পেলেন। কিন্তু পরগাছা প্রতিজ্ঞা করল—যতদিন তাকে মাটি ছুঁতে না হবে, ততদিন সে কারুর ক্ষতি করবে না।

এখন তাই মিস্‌টিলটোকে গাছের শাখায় বেড়ে উঠতে দেখা যায়। আজও খৃীষ্টমাসের সময় লোকে পরগাছাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকে।

সাঁওতালী শিকার-উৎসব

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে

শিকারের গল্প শুনতে প্রত্যেকেই ভালবাসে। কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েদের তো কথাই নেই, বড়রা পর্যন্ত গল্প শুনবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। এর অবশ্য কারণও আছে। শিকারের গল্প নিছক আনন্দ ও উত্তেজনার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তৈরী হয় না, সত্য ও বাস্তবতার স্পর্শ থাকে তাতে। তাই শিকারের গল্প প্রত্যেকের কাছে এত প্রিয়।

মানবজাতির ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, প্রাচীনকালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা শিকারজীবী ছিল। শিকার করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু সে যুগ চলে গেছে। শিকারের পদ্ধতিও গেছে পালটে। শিকারীরা আজ গাছে মাচা বেঁধে কিংবা নিজেকে লুকিয়ে রেখে জীবজন্তু শিকার করে।

কিন্তু সাঁওতালরা আজও তাদের সেই পুরানো পদ্ধতি বজায় রেখেছে। প্রতি বৎসর তারা দলে দলে জঙ্গলে শিকার করতে যায়। শিকার তাদের কাছে একটা বড় উৎসব—অতি প্রাচীন প্রথা। সাঁওতাল সমাজের উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে এই শিকার-উৎসব। জঙ্গলে যত বিপদই থাকুক না কেন, সেদিন কেউ কোন বাধা মানে না।

শিকার সংক্রান্ত সব কিছুর ভার থাকে 'ডিহ্‌রি'র উপর। গ্রামে যেমন পূজা-অর্চনার জন্য 'নায়কে' কিংবা অন্যান্য সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য 'মাঝি', 'জগ্‌মাঝি' থাকেন, তেমনি শিকার-উৎসব পালনের জন্য থাকেন ডিহ্‌রি। তিনিই শিকার-জঙ্গলের অধ্যক্ষ। শিকারের দিন ধার্য করে তিনি শালপাতার সাহায্যে গ্রামে গ্রামে খবর জানিয়ে দেন।

নির্দিষ্ট দিনে শিকারীরা এক এক করে গ্রামের চৌমাথায় উপস্থিত হয়। সঙ্গে থাকে তীর-ধনুক, টাঙ্গি, বর্শা প্রভৃতি নানারকম অস্ত্রশস্ত্র। তা ছাড়া, রাত্রিবেলা জঙ্গলে নাচগান ও আমোদ-প্রমোদের জন্য থাকে ঢাল-ঢোল, মাদল, বাঁশী প্রভৃতির বাদ্যযন্ত্র। শিকারের জঙ্গলে নানা বিপদ আছে, তাই তারা যাবার আগে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নেয়। সমবয়সীদের প্রীতি-সম্ভাষণ জানিয়ে ও গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে তারা শিকারের উদ্দেশে বের হয়। এ তাদের জীবনের বিজয়-অভিযান।

চৌমাথায় শিকারীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র রেখে গোলাকারভাবে দাঁড়ায়। গ্রামের ওঝা সেখানে উপস্থিত থাকেন। তিনি কিছু দূর্বাঘাস, লজ্জাবতী লতার পাতা ও কাঁটা গাছের পাতা হাতে নিয়ে নানারকম মন্ত্র পড়তে পড়তে সবাইকে প্রদক্ষিণ করেন এবং শিকারীরা যে পথে যাবে সে পথের উপর ওগুলি ছড়িয়ে দেন। তারপরই শুরু হয় শিকারীদের যাত্রা।

শিকারীরা গ্রামের সীমানায় উপস্থিত হলে, 'কুডাম নায়কে' (প্রধান পুরোহিতের সহকারী) সেখানে গ্রামের

সমস্ত দেবতার উদ্দেশে নিজের শরীরের কয়েক ফোঁটা রক্ত উৎসর্গ করেন। এই রক্তদানকে সাঁওতালীতে বলে 'বুল্ মায়াম্'। দেবতারা যেন শিকারীদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে নিরাপদে গ্রামে ফিরিয়ে আনেন ও শিকারীদের যাত্রা সফল করেন, তারই জন্য এ অনুষ্ঠান হয়। কুডাম নায়কের কাজ শেষ হলে শিকারীরা সোজা জঙ্গলের পথে রওনা হয়। কেউ পিছনে ফিরে তাকায় না। এদিকে, শিকারীরা যে কয় দিন বাইরে থাকবে, সে কয় দিন বাড়ীর লোকেরা কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে না কিংবা শরীরে তেল মাখে না।

শিকারের জঙ্গলের সামনে বিভিন্ন গ্রামের শিকারীরা উপস্থিত হয়, কিন্তু ডিহ্রির বিনা অনুমতিতে তারা জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারে না। তারা ডিহ্রির সঙ্গে দেখা করে নিজ নিজ গ্রামের পরিচয় দেয়। ডিহ্রি তখন শালপাতায় কিছু তেল মাখিয়ে সে গ্রামের ভবিষ্যৎ গণনা করেন ও কোন ভাবী বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা তা জেনে নেন। কারো বিপদ দেখলে তাকে তিনি ফিরে যেতে বলেন। সে যদি ফিরে যেতে রাজী না হয়, ডিহ্রি তখন তার নামে দেবতার কাছে একটি মুরগী উৎসর্গ করেন এবং দেবতার কাছে এই বলে মিনতি করেন, যেন তিনি তার সহায় থাকেন। পরে তিনি বনদেবীর উদ্দেশে আরো কয়েকটি মোরগ উৎসর্গ করেন। এভাবে সেখানকার সমস্ত কাজ শেষ হলে পর শিকারীরা জঙ্গলে প্রবেশের অনুমতি পায়। তখন ঢাক-ঢোল বাজাতে বাজাতে ও শিঙ্গাধ্বনি দিতে দিতে শিকারীরা জঙ্গলে প্রবেশ করে।

শিকারের নেশায় তারা ক্লান্তি ভুলে যায়, ক্ষুধা তৃষ্ণাও ভুলে যায়। সারা দিন ধরে শিকারের সন্ধানে ছুটোছুটি করে সন্ধ্যাবেলা শিকারীরা সমবেত হয় নির্দিষ্ট জায়গায়। তখন শুরু হয় তাদের নাচগান। জ্যোৎস্না রাত্রে তাদের নাচগানে সমস্ত জঙ্গল ভরে উঠে। সামনে শিকার করা জীবজন্তুর মৃতদেহ। কেউ বা শিকার করা জন্তু আগুনে ঝলসাচ্ছে, কেউ বা আগুনে মাংস পোড়াচ্ছে। কেউ নাচে মেতেছে, আবার কেউ রান্নার আয়োজন করছে।

এ যেন এক আদিম যুগের দৃশ্য! চোখে না দেখলে শুধু বলে শেষ করা যায় না।

গভীর রাত্রে উৎসব শেষ হয়। শুরু হয় তখন শিকার-বৈঠক। ডিহ্রির পরিচালনায় এই শিকার-বৈঠক বসে। এটাই তাদের সর্বোচ্চ বিচারালয়—হাই-কোর্ট। শিকারে আসার গুরুত্ব এইখানেই। যে সমস্ত গোলমাল, বিবাদ কিংবা সামাজিক সমস্যা গ্রামে সমাধান হয়নি, সে সমস্ত একমাত্র শিকার-জঙ্গলেই তারা সমাধান করে। ডিহ্রি এই শিকার-বৈঠকের পরিচালক। বিচার করে দেশের জনসাধারণ। মাঝি, পারগানা, জগ্ মাঝিরা উপস্থিত থাকলেও সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকে ডিহ্রির উপর। গ্রামের প্রধানরা কোন গরীবের উপর অবিচার করে থাকলে, সে সেদিন এখানে নির্ভয়ে তা ব্যক্ত করতে পারে। ডিহ্রি দেশবাসীর মতামত অনুসারে ন্যায্য বিচার করেন। সবাই মেনে নেয় সেই বিচারের সিদ্ধান্ত। প্রাচীন যুগের গণতন্ত্রের রূপ আমরা এখানেই দেখতে পাই।

পরদিন আবার তারা বেরিয়ে পড়ে গভীর জঙ্গলের পথে শিকারের সন্ধানে। ঢাক-ঢোলের শব্দে ও ঘন ঘন শিঙ্গাধ্বনিতে সমস্ত জঙ্গল কম্পিত হয়। পশুপাখী সব ভয়ার্ত চিৎকার করতে করতে যে যেদিকে পারে পালাতে থাকে। ঢাক-ঢোলের শব্দে ক্রুদ্ধ বাঘ কিংবা বন্য বরাহ বেরিয়ে আসে। মুহূর্তে এক ঝাঁক তীর ছুটে যায় বিদ্যুৎবেগে। পরক্ষণেই আহত জন্তুর তীব্র আর্তনাদ ও গর্জন, শিকারীদের উল্লাস ও শিঙ্গার আওয়াজে চারিদিক পূর্ণ হয়ে ওঠে। খরগোশের দল ভয় পেয়ে গর্ত থেকে বের হয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। শিকারীদের আর এক ঝাঁক তীর ছুটে যায়। খরগোশ কয়েকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

শিকার শেষ করে শিকারীরা যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে যায় নিজের নিজের গ্রামে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আনন্দে ছুটে আসে শিকারীদের সামনে। বাড়ীর মেয়েরা শিকারীদের পা ধুয়ে দেয়। বাড়ীতে বাড়ীতে শিকারের মাংস সমানভাবে ভাগ করে পাঠানো হয়। সমস্ত গ্রাম ভরে ওঠে আনন্দ-উল্লাসে।

ছবিখানি Tribal Cultural Institute-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সর্ষের মধ্যে ভূত!

লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ

"**আমায়** জ্বালাতন করে মারলো। সবাই মিলে আমায় পুড়িয়ে মারলো। ওরা বাঁচতে দেবে না আমাকে, ওরা বাঁচতে দেবে না।" চীৎকার করে উঠলেন পচুবাবু, "এই ঝি-চাকরগুলো থেকে আরম্ভ করে নিজের স্ত্রী, ছেলে, ইঁদুর, মশা-মাছিগুলো সবাই মিলে আমার পেছনে লেগেছে।"

পাশের ঘরে ভৃত্য ভোলার পিলে চমকে ওঠে।

"তাই তো, এই সাত সকালে কত্তার হলো কি? এই তো সবে দাঁত মেজে ঘরে গেলেন। এর মধ্যে কি এমন হলো যে ঝি-চাকরগুলোও বাদ পড়ল না?" গোয়াল সাফ করতে করতে জানালার ফাঁক দিয়ে সে ঘরের সুখী ঝিকে জিজ্ঞেস করে।

ও পাশের ঘরে সুখী ঝি কাজ করতে করতে ঠোঁট উল্টে বলে, "ভগবান জানেন।"

ভোলার মনের মতো উত্তরটা হলো না। তাই মনে মনে ভাবতে থাকে—হায় বাবা! চাকরের আবার দোষ হলো কি? সুখীটা না হয় বড্ড হিংসুটে। কথায় কথায় সন্তুটাকে মারে। গিন্নিমা না হয় সকাল-বিকেল নতুন শাড়ীর জন্য খুঁচিয়ে তোলেন। আর সন্তুটা স্কুলের ভয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু মশা-মাছি বা ইঁদুরগুলো? হ্যাঁ, তাই তো! মশাগুলো তো রাত্রে ঘুমোতে দেয় না, আর ইঁদুরটা পরশু রাত্রে বাবুর জামা কেটেছে।.....কিন্তু চাকরটা কি করল?

আকাশ-পাতাল চিন্তা করে ভোলা।

"কাল বিকেল রেখেছি, আজ সকালে কোথায় গেল?" দাঁত খিঁচিয়ে পচুবাবু আবার চেঁচিয়ে ওঠেন, "আজ আর কারো রক্ষে রাখবো না। চাবুকে ছাল তুলবো।"

ভোলা কয়েক পা এগিয়ে এসে জানালাটা দিয়ে উঁকি মারলো। তাই তো, সমস্ত খাতাপত্র তছনছ করে ফেলেছেন! কোথাও পাচ্ছেন না! কি হারালো? ভোলা ভেবেই অস্থির।

"না, কোথাও নেই। কে নিল?" সরোষে গুমরে

গুমরে ওঠেন পচুবাবু।

ভোলার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে ওঠে। তাই তো কাল যে ও দেশলাইটা নিয়েছে বিড়ি খাওয়ার জন্যে! এটা যে বাবুর সিগারেট খাওয়ার টাইম। নির্ঘাত দেশলাইটাই খুঁজছেন। ভোলার বুকের ভিতরের আওয়াজটা আরও বেড়ে উঠে। ভোলা আর কোন অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করে ট্যাঁক থেকে দেশলাইটা বের করে সুড়ুৎ করে দরজাটা পেরিয়ে বলে, "বাবু, এই যে আপনার দেশলাই।" ভোলা দেশলাইটা টেবিলে রেখে দরজাটা পেরোতে যাবে, ধাঁ করে পচুবাবু দেশলাই ভোলার মাথায় ছুঁড়ে মারলেনঃ "মুখপোড়া, দেশলাই এনেছে! আজ কারো রক্ষে রাখবো না।"

সে আওয়াজে ভোলার হার্টফেল হওয়ার উপক্রম। মরি-বাঁচি করে সে দেয় দৌড়। গোয়ালঘরে এসে হাঁফাতে থাকে। মনে মনে ভাবে—কি ভুলই না করেছি! আমার হাতে যে গোবর! এই হাতেই দেশলাইটা রেখেছি! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে ওঠে ভোলার। একবার মাথাটাতেও হাত বুলিয়ে দেখে—দেশলাইটা কি রকম জোর লেগেছে।

আর এদিকে সুখী ঝি নেংরা হাত ধুয়ে এসে চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে তখন ঘরে ঢুকেছে। টেবিলে রেখে বলে, "বাবু, চা।"

"চা এনেছে! চা কি ছাই দিয়ে খাবে?" বলেই পচুবাবু চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে মাটিতে আছড়ে মারলেন। ঝন্-ঝনাৎ করে চায়ের পেয়ালাটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

সুখী তো অবাক! বড় বড় চোখ করে হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে।

"দূর! দূর!" রাগে ফুঁসে ওঠেন পচুবাবু, "চা এনেছে! তোমরা আমাকে পুড়িয়ে মারলে।" রাগে দুর্বাসা মুনির মতো রক্তবর্ণ চক্ষু দুটো সুখীকে যেন ভস্ম করতে চাইলো। পচুবাবু যদি সত্যি দুর্বাসা মুনি হতেন, তাহলে সুখীটা এতক্ষণে ভস্ম হয়ে যেত।

সুখী থতমত খেয়ে দরজা পেরিয়ে যায়।

কে জানে কি বলল সুখী রান্নাঘরে গিয়ে। গজ্-গজ্ করতে করতে বেরিয়ে এলেন সুমিত্রা দেবী।

"বলি, কাপ-প্লেটগুলো কি সস্তা? না, পয়সা রাখার জায়গা নেই?" কড়া সুরে জিজ্ঞেস করেন তিনি।

পচুবাবুও ডবল কড়া সুরে খেঁকিয়ে ওঠেন "চা-টা কি ছাই দিয়ে খাব?"

পচুবাবুর এই চণ্ডাশোক মূর্তি দেখে সুমিত্রা দেবী একটু নরম গলায় জিজ্ঞেস করেন, "কি হয়েছে বলো না বাপু? তোমাদের জ্বালায় যে আর পারি না!"

"আমিও কি আর তোমাদের জ্বালায় পারি?" দাঁত বের করে খেঁকিয়ে ওঠেন পচুবাবু।

"না, আমি চললুম।" সুমিত্রা দেবী একটু প্যাঁচ দেখিয়ে উঠে পড়েন।

পচুবাবু ভারী গলায় জিজ্ঞেস করেন, "আমার বিস্কুটগুলো খেল কে?"

"বিস্কুট?" অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন সুমিত্রা দেবী।

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।" বলেই বিস্কুটের ছেঁড়া প্যাকেটটা ছুড়ে দেন সুমিত্রা দেবীর দিকে, "কাল বিকেলে এনেছি, আজ সকালে নেই। মাত্র ঐ চারটে!" আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দেন পচুবাবু।

"এ কি ফ্যাসাদ! বিস্কুট ভূতে খেল, না বিলেত থেকে চোর এল খেতে?"

"তবে কি তুমি বলতে চাও আমিই খেয়েছি?"

"ষাট বলাই! শোন কথা! আমি কি সেই কথা বলছি না কি?" সুমিত্রা দেবী অবাক হয়ে জোরে হাঁক পাড়েন, "ভোলা, এই ভোলা!"

পচুবাবুও রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুর তুললেন, "সুখী, এই সুখী।"

পাশের ঘর থেকে একটি ক্ষীণ মেয়েলী কণ্ঠের স্বর ভেসে আসে, "কি বলছেন?"

"শোন্ এদিকে। ভোলাকেও ডেকে আন্।" গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছাড়েন পচুবাবু।

ভোলা এগিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে সুখীও। কাঁচুমাচু মুখে দুজনেই দরজার ওপারেই দাঁড়িয়ে থাকে।

"ভেতরে আয়।" পচুবাবু গর্জে ওঠেন।

অচল পা চারটেকে দুজনে কোনরকমে চালিয়ে ভিতরে ঢোকে।

সুমিত্রা দেবী জিজ্ঞেস করেন, "বাবুর বিস্কুট খেয়েছে কে রে?"

দুজনেই নিরুত্তর। পচুবাবু ধমকে ওঠেন, "বল্, কে খেয়েছিস?"

সুখী বললে, "আমি তো খাই নি।"

ভোলারও সেই উত্তর।

পচুবাবু আবার ধমকে ওঠেন, "তবে কি ভূতে খেল?"

সুখী একটু বাহাদুরি নিতে একগাল হেসে বললো "খোকাবাবুই খেয়েছে নির্ঘাত!"

"কি বললি, খোকাবাবু খেয়েছে? আমার ছেলে

চোর? তোর এত বড় স্পর্ধা! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!" পচুবাবু লাল চোখ বের করে ঝাঁঝিয়ে ওঠেন।

সুখীটা কেমন ভড়কে দাঁড়িয়ে থাকে।

"সন্তুকে ডাক্ তো ভোলা।" সুমিত্রা দেবী ভোলাকে নির্দেশ দেন।

"না, স্কুলের দেরি হয়ে যাবে। সে স্কুলে যাক্।" পচুবাবুর এক ধমকে ভোলাটা থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

এই সুযোগে ভোলাও একটু ফোড়ন কাটে, "বাবু, বিস্কুট ঠিক সুখীই খেয়েছে।"

"কি, সুখী খেয়েছে? তাকে আমি আদর করে বাপের বাড়ী থেকে আনলাম। একা সব কাজ পেরে উঠি না। আমার কাজ ছাড়িয়ে নিয়ে ও করে। তার নামেও দুর্নাম! ফের ও কথা বলবি তো তোকে আর এ দত্ত বাড়ীতে থাকতে হবে না।" সুমিত্রা দেবী মুখ ঝামটে ওঠেন।

ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। ভোলার হৃৎ-স্পন্দন বেড়েই চলে। আর সুখীটা তো কোনঠাসা হয়ে দাঁড়িয়েই আছে। পা দুটো থর-থর করে কাঁপছে।

"যা, বেরিয়ে যা।" পচুবাবুর ধমকে প্রাণটা হাতে নিয়ে দুটি প্রাণী নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

"তবে কি বিস্কুটগুলো উড়ে গেল?" সুমিত্রা দেবী ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞেস করেন।

"বিস্কুটগুলো ঠিক ইঁদুরেই খেয়েছে। এই তো সেদিন আমার জামাটাও কেটেছিল।"

"ইঁদুরে খেলে বিস্কুটের টুকরোগুলোর কি হলো? না, গিলে খেয়েছিল?"

তাই তো!" পচুবাবুর মাথা গুলিয়ে যায়, "তবে কে খেল?"

"বিস্কুট ঠিক বিড়ালই খেয়েছে।" সুমিত্রা দেবী তাঁর মত প্রকাশ করেন।

"বিড়াল তো আমাদের সাতজন্মেও নেই। তবে খেল কি করে?"

"কেন গো, ঐ যে রায়বাবুদের বিড়াল! রাত্তিরে বেড়াতে আসে যে। ঐ যে সেই সাদাটা। সেদিন তো চারটে মাছই খেয়ে গেল! সেই যে ইলিশ মাছ।"

"অ্যাঁ, সে কি গো?" কপালে চোখ তোলেন পচুবাবুঃ "তুমি যে আমাদের জ্যান্ত মারবে।"

"তরে কি রাত্তিরে ঘুমাবো না? বিড়ালের জন্য জেগে রইব?" খেঁকিয়ে ওঠেন সুমিত্রা দেবী।

"না গো, সে কথা নয়। ডিপথিরিয়া, ডিপথিরিয়া!"

"ডিপথিরিয়া? মানে?" সুমিত্রা দেবী বোবা দৃষ্টি মেলে ধরেন।

"বিড়ালের এঁটো খেলে যে ডিপথিরিয়া হয়। গলার ভিতর ঘা গো, গলার ভিতর ঘা।"

সুমিত্রা দেবীর গলার ভিতর উসখুস করে ওঠে। আঙ্গুল দিয়ে একটু গলা চুলকে নিয়ে বলেন, "তাহলে এ বিস্কুটও খাওয়া চলবে না?"

"মোটেই না, মোটেই না। তুমি ওগুলো বরং কুকুরটাকেই দিয়ে দাও।"

সুমিত্রা দেবী বিস্কুটের ছেঁড়া প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যান।

খোকাবাবু সন্তু এদিকে স্কুল যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে পড়েছে। বইগুলো হাতে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, "মা, ও ঘরে তোমাদের কি হচ্ছিল?"

"এই যে তোমার বাবার বিস্কুটগুলো বিড়ালে খেয়েছে। এগুলো কুকুরকে দিই।"

"কেন? কেন? কুকুরকে কেন? আমাকেই দাও না।" সন্তু আবদার ধরে।

"আরে, এ যে বিড়ালে খেয়েছে! এ খেলে ডিপথিরিয়া হবে যে!"

"ধ্যেৎ বিড়ালে খাওয়া বুঝি কেউ খায় না? ঐ তো রায়বাবুদের পিন্টুটা সেবারে বিড়ালে খাওয়া দুধটা এক চুমুকেই শেষ করলো। তার তো কিছু হলো না?"

"না, তোমার বাবা মানা করেছেন। এ বিস্কুট কেউ খাবে না। ঐ কুকুরটাকেই দিতে বলেছেন।"

হঠাৎ সন্তুর মাথায় একটা বুদ্ধি গজিয়ে গেল। "আচ্ছা মা, যদি কুকুরটারও ডিপথিরিয়া হয়?" বড় বড় চোখ করে সে জিজ্ঞেস করে।

"তাই তো!"

"আচ্ছা, বিস্কুটগুলো ঐ বিড়ালটাকেই দাও না। ওর তো আর ডিপথিরিয়া হবে না!"

"ঠিক বলেছিস। কিন্তু বিড়ালটা যে রায়বাবুদের! ও যে রাত্তিরে আসে।"

"তার জন্যে কি হয়েছে! আমি স্কুল থেকে এলে বিস্কুটগুলো আমাকে দিও, আমি রায়বাবুদের বাড়ীতে চুপিচুপি দিয়ে আসবো।"

সুমিত্রা দেবী ভাবেন, কথাটা তো নেহাত মন্দ নয়! মনে মনে ছেলের তারিফও করেন।

স্কুল থেকে এসেই সন্তু বলে, "মা, বিস্কুটগুলো দাও, রায়বাবুদের বিড়ালটাকে দিয়ে আসি।"

সুমিত্রা দেবী বিস্কুট চারটে এনে ছেলের হাতে দেন। সন্তু সেগুলো নিয়েই একেবারে ও পাশের

উঠোনে। দুটো বিস্কুট প্যাকেট থেকে বের করেই টপা-টপ্ মুখের ভিতর। আর একটা বিস্কুট বের করতে গিয়েই চোখ ছানাবড়া! তাড়াতাড়ি হাত দু'টোকে সে পেছন দিকে লুকিয়ে ফেলে। সামনে পচুবাবু! সবে-মাত্র স্নান করে ভেজা গামছাটি পরে আসছেন। হেঁড়ে গলায় গর্জে ওঠেন, "কি খাচ্ছিস, খোকা?"

কাঁদো কাঁদো গলায় সন্তু বলে, "কিছু না।"

"ফের মিথ্যে কথা! হাত এদিকে আন্।"

কোন উপায় খুঁজে পায় না সন্তু। বিস্কুটগুলো দেখাতেই হয়। চট্ করে তার কানটা ধরে ফেলেন পচু-বাবু ঃ "বল্ কোথায় পেলি বিস্কুট?"

"মা দিয়েছে।" কেঁদে কেঁদে বলে সন্তু।

"সেই বিড়ালে খাওয়া বিস্কুট?" পচুবাবুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো।

"ওগুলো বিড়াল কখন খেল? আমিই তো কাল খেয়েছিলাম।" ভয়ে মুখ ফস্কে সত্যি কথাটা বেরিয়ে যায় সন্তুর।

"কি! তুই খেয়েছিলি?" বলেই দমাক্-দমাক্ করে পচুবাবু দুটো কিল বসিয়ে দিলেন সন্তুর পিঠে।

সন্তুটা কুঁজো হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। ও ঘর থেকে সুমিত্রা দেবী ছুটে এলেন ঃ "কি হলো, কি হলো?"

"কি আর হবে! আমার মাথা আর ছাই! ওকে সামলাও। লাট সাহেবের পুত্তুর কাল বিস্কুটগুলো খেয়ে বাকীগুলো আজ খাচ্ছে। চোর, বদমায়েস কোথাকার!"

"তাই বলে ছেলেটাকে মেরে ফেলতে হবে নাকি? নিজের ছেলে খেয়েছে তাতে হয়েছে কি?" মুখ ঝামটে ওঠেন সুমিত্রা দেবী।

এ পাশের কোলাহল শুনে ও পাশ থেকে ছুটে আসে ভোলা আর সুখী। আগাগোড়া ব্যাপারটা শুনে ভোলা একটু মুচকি হাসে। সুখীটা আবার একবার বাহাদুরি নেবার জন্য বলে ওঠে, "আমি যে বলেছি, খোকাবাবুই খেয়েছে!" বলেই সে ফিক করে হেসে ওঠে।

"ফের সেই কথা?" পচুবাবু ধমকে ওঠেন।

সুমিত্রা দেবী বেরিয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে সুখীও যায়। তারপর পচুবাবুর পেছনে ভোলাও স্থান ত্যাগ করে।

আর সন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে মুছতে বিস্কুটগুলির সদ্গতি করতে থাকে।

• গল্পের যাদুঘরে •

স্বপ্নের ফল

আঠারো শ' পঁচাশী সালের এক কনকনে শীতের রাত। অসুস্থ রবার্ট ল্যুই স্টিভেনসন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছিলেন। হঠাৎ রাতদুপুরে নিদ্রিত অবস্থাতেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন। স্বামীর আর্তনাদে স্ত্রী চমকে জেগে উঠলেন। রবার্ট ল্যুই দুঃস্বপ্ন দেখছেন ভেবে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ঠেলে জাগালেন।

রবার্ট ল্যুই ঠক্ঠক্ করে কাঁপছিলেন। তাঁর কণ্ঠে ক্রোধের আভাস ঃ তুমি আমাকে কেন ডাকলে? আমি একটা অদ্ভুত ধরনের ভূতুড়ে স্বপ্ন দেখছিলাম।

সে রাত্রে ঘুম হ'ল না রবার্ট ল্যুই স্টিভেনসনের। সকাল হতেই তিনি কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসলেন। লিখতে লিখতে নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলে গেলেন তিনি। তাঁর স্বপ্নে দেখা সেই গল্পই 'দি ষ্ট্রেঞ্জ স্টোরি অব ডক্টর জেকিল এণ্ড মিষ্টার হাইড' বিশ্ববিশ্রুত গল্প।

তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে, রবার্ট ল্যুই স্টিভেনসন তাঁর অনেক গল্পের প্লট, দৃশ্য, চরিত্র এমন কি কথোপকথন পর্যন্ত পেয়েছেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে। তাঁর লেখা 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড', 'কিড্ন্যাপড্', 'ডাঃ জেকিল এণ্ড মিঃ হাইড' এই তিনখানা বই আজও বিপুলভাবে সমাদৃত।

১৮৫০ সালের ৩রা নভেম্বর এডিনবার্গে স্টিভেনর্সনের জন্ম হয় এবং ১৮৯৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

বাউল দাশ

কাউণ্টেসের মণি

সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ ঃ বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

[কোনান ডয়েলের নাম বললে কিশোররা তো বটেই, বড়রাও অনেক সময় চমকে ওঠেন। ঠিক যেন চিনতে পারেন না, অথচ ভীষণ চেনা-চেনা লাগে নামটা। কিন্তু তারপরে যেই বলা হবে শার্লক হোমসের কথা, অমনি সকলে বলে উঠবেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ চিনেছি। চিনতেই হবে, কারণ শার্লক হোমসের অমন অদ্ভুত গল্পগুলোর লেখকই যে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল! পৃথিবীর সমস্ত দেশের পাঠকদের কাছে গোয়েন্দা শার্লক হোমস এতো জনপ্রিয় যে, তাকে আমাদের ঠিক মনে থাকে, কিন্তু মনে থাকে না শার্লক হোমস-এর স্রষ্টাকে। শার্লক হোমসের মতো বৈজ্ঞানিক চ্যালেঞ্জারও সকলের ভীষণ প্রিয়। চ্যালেঞ্জার সাহেবকে নিয়ে লেখা কোনান ডয়েলের 'লস্ট ওয়ার্ল্ড' তো কিশোরদের দারুণ রোমাঞ্চকর বই। যে পড়েছে ঐ বইটা, সে কিছুতেই আদ্যিকালের সেই বিরাটকায় জীবজন্তুর কথা ভুলতে পারবে না।

কোনান ডয়েলের জন্ম ১৮৫৯ সালে। পেশায় তিনি ছিলেন ডাক্তার। ডাক্তার হিসেবে সেনাবাহিনীতেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর সব থেকে প্রিয় কাজ ছিল লেখা। তিনি লিখেছেন যেমন অনেক, তেমনি লেখার বিষয়ও বহু। তিনি লিখেছেন শার্লক হোমসের মতো গোয়েন্দার কাহিনী, ডাঃ চ্যালেঞ্জারের মতো পাগলাটে বৈজ্ঞানিকের কীর্তি-কথা, লিখেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস, অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী ও আরো অনেক কিছু। কিন্তু তাঁর নাম ভুলিয়ে তাঁকেই অমর করে তুলেছে তাঁরই সৃষ্টি দুটি চরিত্র—শার্লক হোমস আর ডাঃ চ্যালেঞ্জার। ১৯৩০ সালে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল মারা গেছেন। কিন্তু তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টি শার্লক হোমসের মধ্যে।]

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। দারুণ শীত সেদিন। সকাল থেকেই ঝুপ ঝুপ করে তুষার পড়ছে। রাস্তাঘাট সব সাদা তুষারে ঢেকে গেছে। কারই বা ইচ্ছে করে ঐ রকম একটা বিষণ্ণ প্রভাতে বাড়ী থেকে বেরুতে!

তবু সেই সকালে ২২১বি, বেকার স্ট্রীটে ওয়াটসন সাহেব এসে হাজির। শার্লক হোমস তখন বসবার ঘরে চুল্লির ধারে একটা চেয়ারের ওপর বসে আগুন পোয়াচ্ছেন। আর একমনে পাইপ টানছেন।

ওয়াটসন চুল্লির ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

হোমসের সামনের টেবিলটার ওপর পড়ে আছে একটা পুরনো টুপি। রং-চটা ঐ টুপিটা দেখে ওয়াট-সন একটু অবাকই হলেন। হবারই কথা। কারণ, টুপিটা যে হোমসের নয়, সে বিষয়ে ওয়াটসন নিঃসন্দেহ। তাহলে টুপিটা এল কোথা থেকে?

ওয়াটসনের মনের ভাব বুঝতে হোমসের এতোটুকুও দেরি হলো না। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে টুপিটা হাতে তুলে নিলেন হোমস। তারপর একটু হেসে ওয়াটসনকে বললেন, "এই টুপিটা দেখে এর মালিক সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হয়, বলো তো?"

টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে উলটে-পালটে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন ওয়াটসন। তারপর হতাশ হয়ে বললেন,

"না বাবা, আমার দ্বারা হবে না। এই টুপি থেকে..." ভালো ছিল, এখন মোটেই ভালো নয়। কিন্তু এখন

ওয়াটসনের কথা শেষ হবার আগেই শার্লক হোমস হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর নিজেই টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে যেন চিঠি পড়ছেন এমনভাবে বলতে শুরু করলেন, "এই টুপির মালিকের অবস্থা আগে বেশ ভালো ছিল, এখন মোটেই ভালো নয়। কিন্তু এখন সম্ভবত ভদ্রলোক খুব বেশী পানাসক্ত হয়ে পড়েছেন। তাই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও সম্পর্ক আর ভালো নেই। লোকটির বয়েস চল্লিশের আশে-পাশে। মাথার চুলের রং ধূসর। চুলে ক্রীম ব্যবহার করেন। কয়েক দিন আগে চুল কেটেছেন। বাড়ীতে গ্যাস বা ইলেকট্রিক লাইট নেই। ওঁরা মোমবাতি ব্যবহার করেন।"

ওয়াটসনের চোখ ততক্ষণে কপালে উঠেছে।

ওয়াটসনের চোখ-মুখের ভাব দেখে হোমস বললেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না তো? এবার শোন, টুপিটা বেশ পুরনো। প্রায় তিন-চার বছর আগে কেনা। অথচ টুপিটা খুব দামী। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, টুপিটা যখন কেনা হয়, তখন ভদ্রলোকের হাতে বেশ টাকা ছিল। তারপর দেখ, সে তিন-চার বছর আর টুপি কেনে নি, একই টুপি ব্যবহার করেছে। এর থেকেও কি বোঝা যাচ্ছে না যে, লোকটির অবস্থা এখন যথেষ্ট খারাপ? স্ত্রীর সঙ্গে লোকটির সম্পর্ক ভালো নেই বলছি এই কারণে যে, টুপিটায় অনেক ধুলো জমে। ক'দিন আগে লোকটি চুল কেটেছে। তাই কাটা চুল লেগে আছে টুপির মধ্যে। চুলের রং দেখে মোটামুটিভাবে লোকটির বয়েস আন্দাজ করা যায়। আর টুপিতে এখনো ক্রীমের গন্ধ আছে। আর বাড়ীতে যে মোম ব্যবহার করা হয় তার প্রমাণ হলো, টুপির গায়ে বেশ কয়েক ফোঁটা মোম পড়ে আছে।"

শার্লক হোমসের কথা শেষ হতে না হতে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন পুলিশ কমিশনার মিঃ পিটারসন। উত্তেজনায় তিনি রীতিমতো হাঁপাচ্ছেন।

"কি ব্যাপার পিটারসন! এতো হাঁপাচ্ছো কেন?"—হোমস একটু যেন অবাক।

"হাঁপাবো না! বলো কি হোমস? সেই যে হাঁস —মানে সেই হেনরী বেকারের টুপি আর হাঁসের কথা বলছি। টুপিটা তো তোমার এখানে রেখে হাঁসটা নিয়ে গেলাম। আজ সকালে সেই হাঁসটা কাটতেই—" পিটারসন ডান হাতের মুঠোটা হোমসের চোখের সামনে তুলে ধরলেন, "তার গলা থেকে বেরিয়ে এল এই বস্তুটি।"

পিটারসনের হাতে ঝলসে উঠলো একটা অত্যুজ্জ্বল নীল পাথর।

বিস্ময়ে হতবাক ওয়াটসনের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। শার্লক হোমসও ভীষণ অবাক হয়ে গেছেন। তাঁর অবাক হবার কারণ অবশ্য আলাদা। ঐ নীল পাথরটা তিনি চিনতে পেরেছেন। ওটা কাউন্টেসের মণি। মাত্র কদিন আগে চুরি গেছে যে হোটেলে কাউন্টেস উঠেছিলেন সেই হোটেল থেকে।

ঘটনাটা পিটারসনেরও জানা। কিন্তু পুলিশ কমিশনার সাহেব স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, কাউন্টেসের সেই চুরি-যাওয়া মণিটা এসে পড়বে তাঁরই হাতে। অথচ সেদিন কতো সহজেই না হাঁস আর টুপিটা তাঁর হাতে এসে গিয়েছিল।

হেনরী বেকার নামে একটা লোক সন্ধ্যেবেলায় হাঁসটা হাতে নিয়ে বাড়ী ফিরছিল। রাস্তায় সে একদল গুন্ডার পাল্লায় পড়লো। তারা ঐ হাঁসটা কেড়ে নেবেই। হেনরী বেকারও দেবে না। সে করলো কি, তার হাতের লাঠিটা মারলে ছুড়ে। গুন্ডাদের গায়ে না লেগে পাশের দোকানের কাঁচের শো-কেসে লাঠিটা লেগে শো-কেসটা তো ভেঙে চুরমার। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় পিটারসন যাচ্ছিলেন সেখান দিয়ে। হেনরী বেকারকে সাহায্য করার জন্যে তিনি ছুটে গেলেন। তাঁকে আসতে দেখে গুন্ডার দল পিট্টান, শো-কেসের কাঁচ ভাঙার দায় এড়াতে হেনরী বেকারও হাঁস আর টুপি ফেলে হাওয়া। তারপর পিটারসন টুপিটা হোমসের জিম্মায় রেখে, হাঁসটা নিয়ে গেলেন বাড়ীতে। পরম উপাদেয় হংসমাংসের এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়! কিন্তু হাঁস কাটতে গিয়েই বিপত্তি।

"বিজ্ঞাপন দরকার।"

"অ্যাঁ?"—হোমসের কথায় পিটারসনের ধ্যান ভঙ্গ হলো, বললেন, "বিজ্ঞাপন?"

"হ্যাঁ।"

হোমসের কথামতো পিটারসন সেইদিনই সন্ধ্যেবেলার সব কটি কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। বিজ্ঞাপনের বয়ান এইরকম, "হেনরী বেকার, তোমার হাঁস আর মাথার টুপি ২২১বি বেকার স্ট্রীটে আছে। তুমি নিজে এসে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে ওগুলো নিয়ে যেতে পার।"

নীল পাথরটা যে আসলে কাউন্টেসের মণি, হোমসের মুখে এই তথ্য জানবার পর থেকে পুলিশ কমিশনারের অবস্থা কাহিল। মণি তাঁর হাতের মুঠোয়, কিন্তু চোর ধরতে না পারলে যে আর মান থাকে না। চোর অবশ্য

মনে মনে তিনি ধরেই রেখেছেন একরকম। ঐ হতভাগা হেনরী বেকারটাই যে নিজে বা লোক লাগিয়ে কাউন্টেসের ঘর থেকে মণিটা হাতিয়েছে, এ বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। সরল মনেই তাঁর সন্দেহের কথা হোমসকে তিনি জানিয়েছিলেন। হোমসের তাতে অমন হেসে উঠবার মানে কি? হেনরী এলেই নাকি সব বোঝা যাবে। তবেই হয়েছে! হেনরীর তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ধরা দেবার জন্যে সে নিজের থেকে এসে হাজির হবে এখানে!

"কিন্তু সেই যে চোর, এ কথা তোমায় কে বলে..." —হোমসের কথা শেষ হলো না, পিটারসন লাফিয়ে উঠে কি যেন বলতে যাবেন, আর ঠিক সেই মুহূর্তে নীচ থেকে ভেসে এল কলিং বেলের তীক্ষ্ন আওয়াজ।

"তোমাদের হেনরী বেকার এসে গেছে, পিটারসন। টুপিটা দেখে হেনরী সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্তে এসেছিলাম, সেটা মিলিয়ে নিও ওয়াটসন।"

শার্লক হোমসের কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চাকরের পেছন পেছন একজন মোটাসোটা লোক এসে ঘরে ঢুকলো। মাথাটা একটু বড়। চুলের রং ধূসর। কিছু দিন আগে চুল কাটা হয়েছে। তার সম্বন্ধে হোমসের সব বিবরণই মিলে গেল। লোকটার কথা শুনে বোঝা যায়, তার পেটে বিদ্যে আছে। কিন্তু পোশাকপরিচ্ছদ এবং হাবভাব দেখে মনে হয়, লোকটি বর্তমানে টাকাকড়ির অভাবে কষ্টে দিন কাটাচ্ছে।

আগন্তুককে বসতে বলে শার্লক হোমস বললেন, "জিনিস দুটো কদিন ধরে আপনার জন্যে রেখে দিয়েছি। কিন্তু আপনি কেন কাগজে বিজ্ঞাপন দেন নি? হাঁসটার পায়ে আটকানো কার্ড থেকে আপনার নামটা জানতে পেরেছি। আপনি নিশ্চয়ই হেনরী বেকার?"

আগন্তুক সলজ্জ হেসে বললেন, "হ্যাঁ, আমিই হেনরী বেকার। আমার ধারণা ছিল, ওগুলো আর ফিরে পাব না। তাই আর বিজ্ঞাপন দিতে চাই নি।"

হোমস এইবার মোক্ষম চাল চাললেন, "মিঃ বেকার, হাঁসটা আপনার দারুণ ছিল, তাই লোভ সামলাতে না পেরে ওটাকে আমরা সদ্ব্যবহার করেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে হেনরী বেকার উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন, "সে কি? খেয়ে ফেলেছেন? তাহলে কি হবে?"

হেনরী বেকারের অসহায় আর নিরাশ মুখের দিকে চেয়ে হোমস সান্ত্বনার সুরে বললেন, "না না, আপনি ঘাবড়াবেন না। আপনারটার চেয়েও মোটাসোটা আর একটা হাঁস আমরা এনে রেখেছি আপনার জন্যে।"

একটা চাপা আনন্দের ভাব খেলে গেল হেনরী বেকারের মুখে, "ও, আচ্ছা! তাহলেই হবে।"

হেনরী বেকারের নিশ্চিন্ত ভাব লক্ষ্য করে হোমস একবার আড় চোখে ওয়াটসন আর পিটারসনের দিকে তাকালেন। তাঁদের অনুমান যে কতো ভুল, এতক্ষণে তাঁরা তা বুঝে গেছেন। হোমস জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা মিঃ বেকার, হাঁসটা আপনি কোত্থেকে পেয়েছিলেন?"

"মিউজিয়ামের পাশের 'আলফা ইন' হোটেলে আমরা কজন রোজই যাই। এ বছর ঐ হোটেলের মালিক একটা 'গুজ ক্লাব' বা 'হংস ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি হপ্তায় অল্প কিছু পয়সা নিয়মিত দিয়ে গেলেই বড় দিনের সময় একটা হাঁস পাওয়া যাবে জানতাম। আমিও ঐ ক্লাবের মেম্বার ছিলাম আর প্রত্যেক হপ্তায় পয়সা দিতাম। তাই বড় দিনের সময় ঐ হাঁসটা পেয়েছিলাম। কিন্তু তারপর গুন্ডারা এসে.....সে সব তো জানেন।"

হোমস আর কথা বাড়ালেন না। বেকার নিশ্চিন্ত মনে তার টুপি আর হাঁস নিয়ে বাড়ীর পথ ধরলেন।

শার্লক হোমস ওয়াটসনকে নিয়ে সেদিনই সেই কনকনে ঠান্ডার মধ্যে গিয়ে হাজির হলেন 'আলফা ইন' হোটেলে। সেখানে গিয়ে খেতে খেতে হোটেলের মালিকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তার কাছ থেকে জেনে নিলেন যে, হেনরী বেকারের হাঁসটা কেনা হয়েছিল কভেন্ট গার্ডেনের ব্রেকিনরিজের কাছ থেকে।

দুজনে গিয়ে হাজির হলেন কভেন্ট গার্ডেনে—তারপর সাইনবোর্ড দেখে ব্রেকিনরিজের দোকানে।

"নমস্কার ব্রেকিনরিজ, সব হাঁস বিক্রি হয়ে গেছে দেখছি।"

দোকানদার অবাক হয়ে আগন্তুকদ্বয়ের দিকে তাকায়। কিন্তু চিনতে পারে না। অথচ অচেনা লোকের মুখে নিজের নাম শুনে একটু যেন চমকে যায়।

"এখন নেই বটে, কিন্তু কাল সকালে আপনাকে পাঁচশ হাঁস দিতে পারবো।"

"কিন্তু আমার যে এখনই চাই।"

বিরক্ত হয়ে ব্রেকিনরিজ পাশের দোকানটা দেখিয়ে বলে, "ওখানে যান—অনেক হাঁস আছে।"

"কিন্তু আপনার কাছ থেকেই যে নিতে বলেছিল।"

"কে?"

"আলফা ইনের মালিক।"

"ও, হ্যাঁ, ওকে দু ডজন হাঁস দিয়েছিলাম।"

"সে হাঁসগুলো কোথায় পেয়েছিলেন?"

হোমসের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ব্রেকিন-

রিজ। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, "আমি তা বলবো না। আপনি এখন আসতে পারেন।"

"দেখুন, হাঁস সম্বন্ধে আমার নিজের কতকগুলো ধারণা আছে। আমি সেটা যাচাই করে নিতে চাই। আলফা ইনে যে হাঁসগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলো গ্রামের হাঁস। এর জন্যে আমি পাঁচ শিলিং বাজী ধরছি।"

ব্রেকিনরিজ হাসলো, "হাঁস সম্বন্ধে আপনার ধারণার প্রশংসা করতে পারলাম না। ঐ হাঁসগুলো গ্রামের? মোটেই না। আমি বলছি ওগুলো শহরের।"

"হুঃ! বললেই আমি বিশ্বাস করবো? বাজী যখন ধরেছি, তখন প্রমাণ চাই।"

"প্রমাণ চাই? আচ্ছা দাঁড়ান প্রমাণ দিচ্ছি। খাতা দুটো দাও তো। এই দেখুন, এই খাতাটায় শহরের বিক্রেতাদের নাম-ঠিকানা লেখা—এদের কাছ থেকে আমি হাঁস কিনি। এই দেখুন, ২২শে ডিসেম্বর সাত শিলিং ছ পেন্স করে চব্বিশটা হাঁস কিনেছিলাম মিসেস ওকসটের কাছ থেকে। তাঁর বাড়ীর ঠিকানাও লেখা আছে—১১৭ ব্রিক্সটন রোড। বিশ্বাস হলো তো? দিন এবার বাজীর পয়সা। যেমন কর্ম তেমনি ফল।"

খুবই যেন নিরাশ হয়েছেন এমন ভাব দেখিয়ে পাঁচ শিলিং ব্রেকিনরিজের সামনে ফেলে দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন হোমস। এবার একটা গাড়ী ধরে সোজা যেতে হবে মিসেস ওকসটের বাড়ী।

গাড়ী ধরার জন্যে ওঁরা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় ভেসে এল ব্রেকিনরিজের চিৎকার, "আমি কিছু জানি নে! মিসেস ওকসটের কাছ থেকে আমি চব্বিশটা হাঁস কিনেছিলাম, সেগুলো বিক্রি করে দিয়েছি। ব্যাস্ আমার কাছে বলতে আসা কেন! তার মধ্যে একটা হাঁস তোমার ছিল তো ওকসটের কাছে যাও। এখানে ঘ্যানঘ্যান করে কোন লাভ হবে না!"

হোমস ততক্ষণে লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, "দোকানদারের সঙ্গে তুমি যে বিষয়ে কথা বলেছিলে, সে বিষয়ে আমি সাহায্য করতে পারি।"

"না পারেন না। এর কিছুই আপনার জানার কথা নয়।"

"আমার নাম শার্লক হোমস। কারো যা জানার কথা নয়, আমি তা জানি। তুমি দোকানদারের কাছ থেকে যা জানতে চাইছিলে তা হলো, ১১৭ ব্রিক্সটন রোডের মিসেস ওকসট যে চব্বিশটা হাঁস ব্রেকিনরিজকে বিক্রি করেছিলেন, সেগুলো সে কি করলো—তাই তো? সেগুলো সে আলফা ইনের মালিককে বেচেছিল। আর তিনিও তাঁর গুজ ক্লাবের চব্বিশ জন সভ্যকে ওগুলো দিয়ে দেন। এর মধ্যে হেনরী বেকারের....."

লোকটা এবার হোমসের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললো, "আপনি জানেন স্যার, সেই হাঁসটা কোথায়?"

"চলো, বাড়ী গিয়ে আগুনের পাশে বসে সব বলা যাবে আর তোমার যা বলার আছে তাও শোনা যাবে।"

বেকার স্ট্রীটের বাড়ীতে বসে লোকটি তার কাহিনী বললো। লোকটির নাম রাইডার। কাউন্টেসের ঐ হোটেলে সে কাজ করে। মাঝপথে রাইডারকে থামিয়ে দিয়ে হোমস বললেন, "সাদা লেজের ওপর একটা লম্বাটে কালো দাগওলা হাঁস খুঁজছো তো তুমি?"

রাইডার কাঁপছে, "হ্যাঁ স্যার, সেই হাঁসটাই বটে।"

"শোন রাইডার, তোমার সেই অসাধারণ হাঁসটা মরবার আগে একটা আশ্চর্য ডিম পেড়ে গেছে—এই দেখ সেই ডিম।" এই বলে হোমস মণিটা দেখালেন।

রাইডার হঠাৎ হোমসের পা জড়িয়ে ধরলো, "আমাকে বাঁচান স্যার। আমি কখনো অন্যায় করি নি। লোভে আর কুসংসর্গে পড়ে আমি কাউন্টেসের মণিটা চুরি করেছিলাম। কিন্তু সেটা তো এখন আপনার হাতে। আপনি দয়া করে আমায় পুলিশে দেবেন না। আমার বুড়ো বাবা-মা তাহলে বাঁচবেন না।"

রাইডার এর পর সব কথা স্বীকার করলো। মণিটা হাতে পেয়ে সে সোজা তার বোন মিসেস ওকসটের বাড়ী চলে যায়। বড়দিনে ওকসট ওকে একটা হাঁস দেবে বলেছিল। তাই সে গোপনে সাদা লেজের ওপর কালো দাগ দেওয়া হাঁসটা ধরে মণিটা গিলিয়ে দেয়। কিন্তু সে জানতো না যে, ঐ রকম দুটো হাঁস আছে। জানলো তার পরের দিন কিলবার্নে গিয়ে হাঁসটা কাটার পর। মণি না পেয়ে সে বোনের বাড়ী ছুটে যায়। কিন্তু তখন আর একটাও হাঁসই নেই। আগের দিন সন্ধেয় মিসেস ওকসট সব হাঁসই ব্রেকিনরিজকে বিক্রি করে দেয়, আর সেখান থেকে হাঁসগুলো আলফা ইনে। আর হেনরী বেকারের ভাগ্যেই জোটে রাইডারের হাঁসটা।

ধরা পড়ে গেল রাইডার। কিন্তু তার বাবা-মার নামে কান্নাকাটি আর বাইবেল হাতে নিয়ে শপথ করার বহর দেখে শার্লক হোমস বুঝলেন যে, রাইডার আর সহজে অন্যায় কাজ করবে না। তাকে তিনি ছেড়ে দিলেন।

পুলিশ কমিশনার পিটারসন সাহেব নিজে গিয়ে কাউন্টেসকে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন তাঁর মণি.....।

পাহাড়ের নাম করালী

প্রেমেন্দ্র মিত্র

● ধারাবাহিক উপন্যাস ●

॥ পূর্ব প্রকাশিতের পর ॥

কামরার মাঝখানে একটা বোমা ফাটাবার মত খবরই ছেড়ে দিলাম।

কিন্তু ফলটা যা আশা করেছিলাম তা পুরোপুরি পেলাম না।

নাগাপ্পাই বোমাটাকে কেমন যেন কাঁচিয়ে দিলেন, —দিলেন অতি সস্তা একটি প্যাঁচে।

আমার মুখে নাগাপ্পার সেই নির্জন পাহাড়ী প্রান্তরে বেপরোয়া গুলি ছোড়ার খবর শুনে আর সকলে রীতিমত হতভম্বই হয়ে যাচ্ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু নাগাপ্পা হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে ওঠায় হাওয়াটা একেবারে হালকা হয়ে গেল।

তাহলে ত খুব মজার নাটক হয়েছিল.—নাগাপ্পা হাসতে হাসতেই বললেন, আপনার হাত পা নিশ্চয়ই তখন ভয়ে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছল! অজ্ঞান টজ্ঞান হয়ে যান নি ত?

কথাগুলো বলার ধরনে অনেকের মুখেই তখন কৌতুকের হাসির রেখা একটু ফুটে উঠেছে। হাসি তামাসার সুরটা কাটাবার জন্যে যতদূর সম্ভব গম্ভীর ও কড়া গলায় বললাম,—ব্যাপারটা ঠাট্টার নয় মিঃ নাগাপ্পা। ও গুলিতে একটা খুন জখমও হতে পারত!

হলে সেটা ভৌতিক ব্যাপার হত!—নাগাপ্পা আগের মতই হাসতে হাসতে বললেন,—কারণ পিস্তলে আসলে গুলি ত ছিল না। ফাঁকা আওয়াজ করেছিলাম মাত্র।

ফাঁকা আওয়াজ করেছিলেন!—কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম শুধু এ মিথ্যের প্রতিবাদ করবার কোনো উপায় নেই বুঝে। ফাঁকা আওয়াজ করেছিলেন না সত্যিই গুলি ছুড়েছিলেন তা এখন কেমন করে প্রমাণ হবে? নিরুপায় হয়ে নাগাপ্পার কথাটাই যেন মেনে নিয়ে তারপর গলাটা সমান রুক্ষ রেখেই জিজ্ঞাসা করলাম,—কিন্তু ফাঁকা আওয়াজই বা কেন করলেন বলতে পারেন?

কেন আর!—নাগাপ্পা যেন আমার বুদ্ধির অভাবে অবাক, — ভয় দেখাবার জন্যে!

কাকে?—এবার তীক্ষ্ণ প্রশ্নটা সরকার সাহেবের।

ফাঁকা আওয়াজে ভয় পাওয়ানো যায় এমন কাউকে! মুখে বিদ্রূপের হাসি থাকলেও এবার উত্তরটা দিতে নাগাপ্পার যেন দু এক মুহূর্তের দ্বিধা দেখলাম,

—জায়গাটা ত ভালো নয়। বুনো হাতির ত তখনই চিহ্ন পেয়েছি, তা ছাড়া ভালুক কি চিতারও অভাব নেই। যেখানে বসে ছিলাম তার কিছু দূরে কয়েকটা ঝোপ-ঝাড় পাথুরে ঢিবির পেছনে কি রকম একটা শব্দ যেন শুনতে পাই। সাবধানের মার নেই। সেদিকে এগিয়ে গিয়ে তাই দুটো ফাঁকা আওয়াজ করি। তেমন কোন জানোয়ার থাকলে বেরিয়ে পড়ে ভয়ে ছুটে পালাবে।

জানোয়ার ত কিছু বার হয়নি?—সরকার সাহেবই স্পষ্ট সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নাগাপ্পার দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

তা ত হয়ই নি! নাগাপ্পা এবার একটু বিরক্তির সঙ্গেই উত্তর দিলেন,—আর হয়নি বলেই ফিরে নিজের কাজে চলে যাই। ওখানে যে মিঃ হাজরা লুকিয়ে বসে আছেন তা ত তখন কল্পনাই করতে পারিনি।

বলতে যাচ্ছিলাম যে, শুধু মিঃ হাজরা নয়, আরো একজন তার সঙ্গে সেখানে বসে তাঁর কীর্তিকলাপ সব দেখেছে। কিন্তু খুব সময়মত নিজেকে সামলে গেলাম। সত্যিই নাগাপ্পাকে এভাবে জেরা করে কোনো লাভ নেই।

সোজাসুজি তাঁকে মুঠোয় ধরতে গেলে পিছল পাঁকাল মাছের মত কিরকম হড়কে তিনি বেরিয়ে যেতে পারেন তা ত ভালো করেই দেখলাম। তাঁর শয়তানী প্রমাণ করবার জন্যে আরো তোড়জোড় ও কৌশল দরকার। প্রমাণের বেড়াজাল এমনভাবে তাঁর চারিদিক থেকে গুটোতে হবে যাতে পালাবার রাস্তা আর তিনি না পান।

মামাবাবুও সেই কথাই বুঝে নিশ্চয়ই এতক্ষণে একটু অধৈর্যের সঙ্গে বললেন,—এ আলোচনা আর চালিয়ে কোনো লাভ আছে বলে ত মনে হচ্ছে না। যা যা সূত্র আমরা এ পর্যন্ত পেয়েছি সেগুলো নিয়ে সবাই আজকের দিনটা আমরা ভালো করে ভেবে দেখি। কাল সকালে আবার আমরা একসঙ্গে বসব। এবার বৈঠকটা আমাদের মহান্তীর ছাউনিতেই হবে। ইতিমধ্যে এ রহস্যের নতুন কোন সূত্র আর সমাধানের মালমশলা হয়ত আমাদের হাতে আসতে পারে।

সেইরকম মালমশলাই মামাবাবুর হাতে তুলে দেবার সংকল্প করে নাগাপ্পার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম।

তাঁবু থেকে বার হবার সময় নাগাপ্পার নির্লজ্জ অন্তরঙ্গতার চেষ্টায় বেশ একটু অবাক হতে হল। আর সকলের সঙ্গে তাঁবুঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেও তখন একলাই আলাদা রাস্তায় চলেছি। যতক্ষণ এ সভায় ছিলাম সেই সময়ের মধ্যে বঙ্কুবাবু ফিরে এসেছেন কি না খোঁজ নেওয়ার জন্যে সরকার সাহেবের তাঁবু আর ক্যান্টিনটা ঘুরে যাওয়াই উদ্দেশ্য।

কয়েক পা যেতে না যেতেই হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনে চমকে দাঁড়াতে হল। ডাকছেন আর কেউ নয় স্বয়ং নাগাপ্পা।

আমার মুখের ভ্রূকুটিটা তখন খুব অস্পষ্ট নয়। কিন্তু নাগাপ্পা সেটা যেন লক্ষ্যই না করে পরম আপ্যায়নের হাসি হেসে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন,—ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? ক্যান্টিনে? নাই গেলেন আর। লাঞ্চটা আজ আমার এখানেই সারুন না!

না, ধন্যবাদ!—ভদ্রতার হাসির ভানটুকু পর্যন্ত না করে জবাব দিলাম।

কিন্তু জন কয়েকটা ভালো টিনের খাবার এনেছে। নাগাপ্পা তবু খাবারের ঘুষ দিয়ে জপাবার চেষ্টা করলেন,—ক্যান্টিনের সেই ত একঘেয়ে খানা! একটু মুখ বদলে যান না!

না, আমার এখন অন্য কাজ আছে। বেশ রুক্ষ-ভাবেই জানিয়ে এবার সোজা বেরিয়ে চলে গেলাম। নাগাপ্পার মুখের চেহারাটা এ জবাবে কিরকম হল, লোভ হওয়া সত্ত্বেও একবার ফিরেও দেখলাম না।

যেতে যেতে নাগাপ্পার এই নির্লজ্জ আপ্যায়নের কারণটা বোঝবার চেষ্টা করছিলাম।

আমাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করে কি মতলব সে হাসিল করতে চায়?

আমি যে তার গোপন গতিবিধি জেনে ফেলেছি সে সম্বন্ধে ত আর কোন প্রশ্নই নেই। সকলের কাছেই তা আমি প্রকাশ করেছি। এরপর জানাটা আমার কতদূর, যেটুকু বলেছি. তা বাদে আরো কিছু আমি হাতে রেখেছি কি না তাই বার করাই কি তার উদ্দেশ্য?

শুধু লাঞ্চ খাইয়েই কি তা সে বার করবার আশা রাখে? আর বার করতে পারলেও তাতে তার লাভ কি হবে কিছু?

আমার মুখ ত তাকে বন্ধ করতে হবে! কেমন করে তা সে করবে ভেবেছিল? লাঞ্চের টিনের খাবারের চেয়ে আরো বড় কোনো ঘুষের ব্যবস্থায়?

একবার এমনও মনে হচ্ছিল যে, নাগাপ্পার লাঞ্চের নিমন্ত্রণটা নিলেও মন্দ হত না। বেকায়দায় পড়ে কি চাল সে চালে তা অন্ততঃ জানা যেত।

কিন্তু নাগাপ্পা কি এমন সোজা লোক যে তার সব প্যাঁচ আমি এত সহজেই ধরে ফেলতাম!

সে একেবারে পাকা ঘুঘু! উদ্দেশ্যটা তার যত

স্পষ্টই হোক তা সফল করবার জন্যে সামনাসামনি ঘুষ দেবার মত এমন একটা মোটা চাল সে চালবে না।

লাঞ্চটা সুতরাং তার মতলব হাসিলের একটা নির্দোষ ভূমিকা মাত্র। সে ভূমিকা থেকে তার গোপন চাল ধরবার আশা করাই ভুল। লাঞ্চের নিমন্ত্রণ না নিয়ে খুব লোকসান তাই হয় নি।

কিন্তু এখন আমার কি করা উচিত?

সরকারসাহেবের তাঁবু আর ক্যান্টিন, দুজায়গাতেই খোঁজ নিয়ে বঙ্কুবাবু এখনো ফেরেন নি জানবার পর সেইটেই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

নাগাপ্পার তাঁবুঘরের সভায় বঙ্কুবাবুর কথাটা শেষ পর্যন্ত চেপেই গিয়েছিলাম। ভালোই করেছিলাম এ বিষয়ে আমার নিজের কোন সন্দেহ নেই। তার গোপন গতিবিধির সাক্ষী যে একজন নয় দুজন, এখবরটা অন্ততঃ নাগাপ্পা এখনো জানতে পারে নি।

কিন্তু বঙ্কুবাবুর নিরুদ্দেশ হওয়ায় ব্যাপারটা আর ত শুধু নিজের কাছে চেপে রাখা উচিত নয়!

বঙ্কুবাবুর যদি গুরুতর কিছু হয়ে থাকে তাহলে তার জন্যে নিজেকে অনেকখানি দায়ী না করে যে পারব না!

সাঙ্ঘাতিক কিছু যদি নাও হয়ে থাকে তাহলেও অস্বাভাবিক কিছু যে ঘটেছে এ বিষয়ে ত সন্দেহ নেই। ওরকম একটা ভোজন-রসিক বোকা-সোকা ভালো মানুষ সখ করে পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ ত আর বিশ্বাস করবার নয়।

কি যে বঙ্কুবাবুর হতে পারে তা নিয়ে নিজের মনে জল্পনা কল্পনা করতেও যেন ভয় করে।

আর যাই হোক আনাড়ি নতুন লোক ত নন যে পাহাড়-জঙ্গলের রাস্তা ভুল করে পথ হারিয়ে বসে থাকবেন! বরং এ সব অঞ্চলের পথঘাট তাঁর অন্য অনেকের চেয়ে ঢের বেশী মুখস্থ। আদিবাসীদের পাহাড়ের অজানা পাকদণ্ডীর রাস্তায় তিনিই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

তাঁর এক দিন এক রাত না ফেরার কারণ তাহলে ত দুর্ঘটনা বলে ধরতে হয়। পাকদণ্ডীর পথে কোথাও বেকায়দায় পড়ে-টড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে আছেন? না দুর্ঘটনাটা তার চেয়ে বেশী গুরুতর? কোনো হিংস্র প্রাণী, মানে সেই বুনো হাতিটাই.....

এর বেশী আর ভাববার চেষ্টা করিনি।

মনে মনে তখনই সঙ্কল্প স্থির করে নিয়ে সোজা লোকনাথ মাইনিং সিণ্ডিকেটের ছাউনিতে গিয়ে ঢুকলাম।

খাস তাঁবুঘরে মামাবাবু আর মহান্তী তখন লাঞ্চ খেতে বসেছেন।

তাঁদের সঙ্গে সরকারসাহেবও হয়ত জুটে গেছেন ভেবে যে ভয়টা পেয়েছিলাম তা অমূলক। ভাগ্য ভালো যে সরকার সাহেব এ বেলায় নিজের তাঁবুতেই খাওয়া সারতে গেছেন।

আমায় দেখে মহান্তী অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, —কোথায় ছিলে তুমি হাজরা! আমরা ত কতক্ষণ অপেক্ষা করে এই খেতে বসছি!

মামাবাবু একটু হেসে বললেন,—লোধমা পাহাড়ের যা সব গোলমেলে ব্যাপার, তোর জন্যে তল্লাশী পার্টি পাঠাব কি না ভাবছিলাম!

আমার জন্যে নয়, সার্চ পার্টি সত্যিই পাঠান দরকার। খাবার টেবিলে একটা চেয়ার টেনে বসে জোর দিয়ে বললাম,—আর এখ্খুনই।

কার জন্যে!—মহান্তী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

আচ্ছা, যার জন্যেই হোক সে পাঠান যাবেখ'ন! মামাবাবু কথাটাকে আমলই না দিয়ে যেন ছেলেমানুষকে প্রবোধ দেবার ভঙ্গিতে বললেন,—তুই এখন খেতে বোস দেখি!

না, খেতে বসতে পারব না!—সত্যিই অস্থির হয়ে উঠলাম—আমায় যখন আরাম করে খেতে বসতে বলছ তখন একটা লোক কত বড় সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে যে পড়েছে তা ভাবতেও পারছি না। এখনও বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে!

কার কথা বলছিস?—মামাবাবুর মুখে সে তাচ্ছিল্যের ভাব আর নেই।

বলছি বঙ্কুবাবুর কথা।—তীক্ষ্ণস্বরেই জানালাম।

বঙ্কুবাবু! বঙ্কুবাবুর কথা বলছিস!

মামাবাবু যেভাবে নামটা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে উচ্চারণ করলেন তাতে তিনি যে রীতিমত বিচলিত হয়েছেন তা স্পষ্টই বোঝা গেল। তাঁর টনক এতক্ষণে নড়াতে পেরেছি জেনে খুশি হলাম।

কি হয়েছে বঙ্কুবাবু? মহান্তী একটু বিমূঢ়-ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন।

আজ দুদিন ধরে তিনি লোধমা পাহাড়ে ফেরেন নি। —বলে সেদিন সকালে আদিবাসীদের পাহাড়ে আমাদের অভিযানটার প্রায় পুরোপুরি বিবরণই দিলাম।

মামাবাবু আর মহান্তী দুজনেই অত্যন্ত গম্ভীর চিন্তিতমুখে সমস্ত বিবরণ শুনলেন।

মামাবাবুর প্রথম মন্তব্যটা বেশ একটু তীক্ষ্ণই শোনাল তারপর। অভিযোগটা যেন আমার বিরুদ্ধেই—এসব কথা আগে বলিস নি কেন?

তোমায় পাচ্ছি কোথায় যে বলব! আমিও অভিমানটা প্রকাশ করলাম,—তাছাড়া নাগাপ্পার ওখানে এ কথা জানাতেই ত গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে যা দেখলাম শুনলাম তাতে এ কথাটা চেপে যাওয়াটাই ঠিক হয়েছে মনে হচ্ছে।

হুঁ! স্পষ্ট কোনো উত্তর না দিয়ে মামাবাবু তখন তন্ময় হয়ে আর একটা কি যেন ভাবতে ভাবতে উঠে পড়েছেন।

আমি যে হাজির আছি তা যেন ভুলেই গিয়ে মামাবাবু মহান্তীকে তাড়া লাগিয়ে বললেন,—নাও মহান্তী তাড়াতাড়ি তৈরী হও। এখুনি বেরুতে হবে। নাগাপ্পার শুধু একবার খোঁজ নাও।

নাগাপ্পার খোঁজ আবার কেন?—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার দরকার হল না।

নাগাপ্পার সেই হেডবেয়ারা একটা চিঠি নিয়ে তখন সেলাম দিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

চিঠিটা তার হাত থেকে নিয়ে খুলে পড়তে পড়তে মামাবাবুর মুখের চেহারা যা দেখলাম তাতেই চিঠিটায় গুরুতর কিছু আছে বলে সন্দেহ হল।

সে সন্দেহ আরো দৃঢ় হল নাগাপ্পার বেয়ারা চলে যাবার পর মামাবাবুর উত্তেজনাটুকু দেখে।

মস্ত বড় একটা ভুল করে ফেলেছি মহান্তী! নাগাপ্পার চিঠিটা মহান্তীর হাতে দিয়ে মামাবাবু যেন বেশ একটু অস্থির যন্ত্রণার সঙ্গে বললেন,—এই একটা ভুলের জন্যে আমাদের এত সব চেষ্টা বানচাল হয়ে গিয়ে সাংঘাতিক একটা সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। চলো আর এক মুহূর্ত দেরি করা নয়।

আমাকে দুজনে মিলেই সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করায় সত্যিই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম,—কিন্তু ব্যাপারটা কি! কি লিখেছেন নাগাপ্পা তা আমি জানতে পারি না?

নিশ্চয়ই পারো! মহান্তী চিঠির চিরকুটটা আমার হাতে দিয়ে বললেন,—আজ সন্ধ্যায় নাগাপ্পার আমাদের সঙ্গে ল্যাবরেটরিতে একটা কাজে থাকবার কথা ছিল। নাগাপ্পা চিঠিতে জানিয়েছে যে, অন্য বিশেষ দরকারে তাকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে বলে সন্ধ্যায় সে ল্যাবরেটরিতে আসতে পারবে না।

তার মানে নাগাপ্পা এর মধ্যেই বেরিয়ে গেছে? আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ,—মামাবাবু যেন নিজেকে ধিক্কার দিয়েই বললেন,—আর একটু আগে হুঁশ হলে এই যাওয়াটা বন্ধ করতে পারতাম। এখন যে কোনো দুঃসংবাদের জন্যে তৈরী থাকতে হবে। চলো মহান্তী। আজ রাত্তিরটা খোলা আকাশের নিচেই কাটাতে হবে। সামান্য যা একটু দরকার সঙ্গে নাও।

মামাবাবুর কথাবার্তা শুনে আর ভাবগতিক দেখে আমি তখন যেমন অবাক তেমনি দস্তুরমত ক্ষুব্ধ। মহান্তী মামাবাবুর ফরমাশ রাখতে যাওয়ার পর বেশ গম্ভীর হয়ে বললাম,—তোমরা কোথায় কেন যাচ্ছ বুঝতে পারছি না। তা বোঝবারও এখন দরকার নেই। কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি ত?

তুই?—মামাবাবু বেশ একটু ফাঁপরে পড়েছেন মনে হল। একটু ইতস্ততঃ করে শেষে একটু যেন অপ্রস্তুত-ভাবেই বললেন,—তুই,—মানে,—তুই গেলে এ লোধমা পাহাড়ে পাহারায় থাকবার আর কাউকে পাব না যে! মহান্তীর এ অঞ্চল ভালো করে চেনা বলে তাকে সঙ্গে নিতে হচ্ছে। কিন্তু এখানেও হুঁশিয়ার বিচক্ষণ কারুর থাকা ত দরকার! এ ভার নেবার মত আর কেউ যে নেই!

কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়, কিন্তু যুক্তির খাতিরে নয়, অভিমানেই টঙ-হয়ে-যাওয়া-মেজাজে গোমড়া মুখে মামাবাবুর অনুরোধটা তখনকার মত বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলাম। [ক্রমশঃ]

★ নাম ছিল যার অ্যান ফ্রাংক

দেবব্রত রায়

অ্যান ফ্রাংকের ডাইরি বিশ্বসাহিত্যের একটি অমর নাম, একটি স্মরণীয় অবদান। আর নাম ছিল যার অ্যান ফ্রাংক, সেই ছোট্ট মেয়েটি বিশ্বের সর্বকালের বিস্ময় হয়ে থাকবে। আজও তার জন্মদিনে হাজার হাজার মানুষ—বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীর দল দেশ-বিদেশ থেকে অ্যানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায়। বলে, অ্যান, তোমাকে আমরা ভুলতে পারি না। তোমাকে ভুলে যাওয়া মানে আমাদের এক সত্তাকে ভুলে যাওয়া!

তখন হিটলারের রাজত্বকাল। অটো ফ্রাংক নামে এক ইহুদী ছিলেন জার্মানির একটি ছোট ব্যাংকের পরিচালক। ১৯২৬ সালে তাঁর এক মেয়ে হলো—নাম তার মার্গট। তিন বছর বাদে ১৯২৯ সালে আরও একটি মেয়ে জন্ম নিল ফ্রাংক পরিবারে। নাম দেওয়া হলো অ্যানেলি মেরী—আদরের নাম অ্যান।

দুই বোন, মা আর বাবা—এই নিয়ে ছোট একটি সুখের পরিবার। কিন্তু অদৃষ্টের বুঝি সে-সুখে ঈর্ষা হলো। ১৯৩৩ সালে হিটলার তখন সমানে ইহুদী স্বার্থ-বিরোধী প্রচার চালাচ্ছেন। অটো বুঝতে পারলেন, বেশি দিন এখানে থাকা চলবে না। তিনি চলে এলেন নেদারল্যান্ডে। আমস্টারড্যামে একটা ছোট মশলার ব্যবসায়ে নামলেন। সেই ব্যবসায়ে একজন সঙ্গীও নিলেন, নাম তার ভান ড্যান।

ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিল। কিন্তু ছোট মেয়ে দুটোর মুখ চেয়ে নিরলস পরিশ্রম করে চললেন অটো ফ্রাংক।

স্কুলে অ্যান কিন্তু মার্গটের মতো লেখাপড়ায় অতো ভালো ছিল না। অটো দুঃখ করে বলতেন, অ্যান আমার এক সমস্যা। লেখাপড়ায় ওর মন নেই। কাজের ভেতর শুধু ঝুড়ি ঝুড়ি কথা বলা আর সাজগোজ নিয়ে মেতে থাকা।

সারাটা দিন অ্যান তার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হৈ-হল্লা করে কাটিয়ে দেয়। প্রায়ই অ্যানের নামে অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়। কোনো বাগানে ঢুকে আপেল পেড়ে এনেছে, নয় কোনো ছেলেকে ধরে প্রচণ্ড মেরেছে অথবা কোনো মেয়ের ব্যাগে পচা ডিম ঢুকিয়ে দিয়েছে।

১৯৪০ সাল, মে মাস। নাৎসীরা নেদারল্যান্ড আক্রমণ করলো। অটো বেশ বুঝতে পারলেন যে, ভাগ্য তাঁর সঙ্গে নিষ্ঠুর পরিহাস করে চলেছে। কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে না। মেয়ে দুটোকে মানুষ করতে হবে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ অন্যায় অত্যাচার নিশ্চয়ই একদিন শেষ হবে। শান্তির সূর্য একদিন না একদিন আকাশ উজ্জ্বল করে নিশ্চয়ই উঠবে। অটো তাঁর পরিবার নিয়ে লুকিয়ে পড়লেন। সঙ্গী পেলেন ভান ড্যানকে এবং আর একজন ইহুদী দন্ত-চিকিৎসককে।

তাঁর মশলার ব্যবসায়ের অফিসের একটি ঘরে গোপন আস্তানা নিলেন অটো। বাড়িটার চার ধারে বিরাট এক পরিখা কাটা ছিল, অনেক গাছপালাও ছিল সেখানে। আশেপাশে অনেকখানি এলাকায় অন্য কোনো মানুষের বাস নেই। লুকিয়ে থাকবার পক্ষে সেটা আদর্শ জায়গা।

কিন্তু অ্যানের অসহ্য লাগে এভাবে বন্দী হয়ে থাকতে। প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না, মন খুলে কথা বলা যায় না। আলোকটা পর্যন্ত জ্বলবে না। অটোর অফিসের দুজন বিশ্বাসী কর্মচারী রোজ সকালে খবরের কাগজ আর দুধ নিয়ে যেত। এ ছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না।

হাঁপিয়ে ওঠে অ্যান। কি করা যায় এখন? মাঝে মাঝে ভাবে, কাউকে না জানিয়ে পালিয়ে যাবো। মরি মরবো। মরতে তো হবেই একদিন। এ ভাবে দম আটকে মরার চেয়ে তা অনেক ভাল। কিন্তু বাবার মুখের দিকে চেয়ে সে-কাজটা আর করতে পারে না অ্যান।

এই ভাবে প্রায় দেড় বছর কেটে যায়। ১৯৪২ সাল। অ্যান ভাবল, একটা কিছু না করতে পারলে সে পাগল হয়ে যাবে। হঠাৎ একদিন তার নজরে পড়ল একটা ডাইরি। অ্যানের জন্মদিনে অটো তাকে একবার ডাইরিটা উপহার দিয়েছিলেন। পাতাগুলো সব সাদাই ছিল। লেখালিখি বা পড়াশুনোর ব্যাপার অ্যানের কোনো দিনই ভালো লাগত না। তাই ডাইরিটা অক্ষত অবস্থায় পড়ে ছিল। অ্যান ভাবল, কিছু না করার চাইতে ডাইরিটা নিয়েই বসা ভালো। শুরু হলো তার লেখা। বেশ কিছু পাতা লেখার পর অ্যান ভাবল,

আমি তো বেশ লিখতে পারছি। এতটা একটানা আমি লিখতে পারি? চেষ্টা করলে বোধহয় আমিও লেখক হতে পারব, পৃথিবী আমাকে চিনতে পারবে তখন।

অ্যান লিখে চলল সেই ডাইরিতে তার শিকারী মনের কথা। অ্যান বোধহয় বুঝতে পারল, তার ডাইরি ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি, বর্তমানের প্রত্যয়—চিরকালের কিশোর মনের প্রতিচ্ছবি। অ্যানের লেখাতে ছিল কিশোর মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-শঙ্কা, আবেগ-চিন্তা আর তার নিজের বন্দী জীবনের অসহ্য নিঃসঙ্গতা।

নিজের নিঃসঙ্গতার বর্ণনা দিতে গিয়ে অ্যান লিখেছিল, আমি এখানে আছি একটা গায়ক পাখির মতো যার ডানা দুটোকে নির্মমভাবে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে! আমি এই বীভৎস অন্ধকার থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে ওড়বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। খাঁচার দেওয়ালে বারবার আঘাত খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছি! কিন্তু হাল ছাড়লে তো চলবে না।

অ্যানের বয়স তখন তের কি চোদ্দ। ডাইরিটাকে সে এক অমূল্য সম্পদের মতো সব সময় নিজের কাছে রাখত। একদিন ডাইরির সব পাতা ফুরিয়ে গেল। কিন্তু সব কথা যে বলা হলো না? এখনও অনেক কথা জানাতে হবে পৃথিবীর মানুষকে। তার বাবার অফিসে মিয়েপ নামে একজন টাইপিস্ট ছিল। তাকে দিয়ে অ্যান একটা খাতা আনিয়ে নিল। পাতার পর পাতা দিনের পর দিন লেখা চলল। লেখার নেশায় খাওয়া-ঘুমনোর কথা অনেক সময় অ্যানের মনে থাকত না। মা এসে বকা-ঝকা করতেন। অ্যান দুঃখ করে লিখেছিল, মা আমাকে বুঝতে চান না অথবা পারেন না।

১৯৪৪ সাল, অগাস্ট মাস। আকাশ কালো হয়ে উঠল। অদৃষ্ট নিষ্ঠুর ভাবে চিৎকার করে হেসে উঠল। সবাই চমকে উঠল, অটো কাঁদলেন। অ্যান বলল, এই খেলাই খেলব বলে প্রস্তুত ছিলাম।

একজন জার্মান এবং চার জন ওলন্দাজ নাৎসী পুলিশ কি ভাবে গোপন আস্তানার সন্ধান পেয়ে একদিন সেখানে ঢুকে পড়ল। সবাইকে গ্রেপ্তার করা হলো। শুরু হলো অকল্পনীয় অত্যাচার। তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো দক্ষিণ পোলান্ডের নাৎসী ক্যাম্পে। সেখানে অ্যান, মার্‌গট আর তাদের মাকে রাখা হলো মেয়েদের ক্যাম্পে। অটো এবং অন্যান্য পুরুষেরা গেলেন পৃথক ক্যাম্পে। অ্যানের মা অকথ্য অত্যাচার আর অনশন সহ্য করতে পারলেন না। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। দন্ত-চিকিৎসক আর ভান ড্যানও প্রাণ হারালেন।

অ্যান দিদিকে সাহস দিয়ে বলত, দিদি ভয় পাসনে। শক্ত হতে হবে আমাদের। না হলেই পশুগুলো শেষ করে দেবে।

একদিন অ্যান দেখল, প্রায় এক শ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে আর সেই সঙ্গে বইছে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। অ্যান জানতে পারল যে, ঐ শিশুগুলোকে 'গ্যাস চেম্বারে' ঢুকিয়ে হত্যা করা হবে।

নাৎসী সৈনিকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল অ্যান, ওরে জানোয়ারের দল, মানুষের চোখ দিয়ে ঐ শিশুগুলোর মুখের দিকে চেয়ে দেখ্.....

গালে এক প্রচণ্ড চড় খেয়ে অ্যান মাটিতে পড়ে গেছল। তারপর তার মাথা কামিয়ে দেওয়া হলো আর অনশনে রাখা হলো অনেক দিন। সেই অনাহার আর অত্যাচারের সঙ্গে বেশি দিন লড়াই করা গেল না।

১৯৪৫ সালের মে মাস। ষোল বছর বয়সে অ্যান তার শেষ কথা বলল, অদৃষ্ট, তোমার নিষ্ঠুর খেলা কবে শেষ হবে?

সে খেলা শেষ হবার অনেক আগে অ্যান কিন্তু নিজে শেষ হয়ে গেল। মার্‌গটও মারা গেল কিছুদিন পরে। সব শেষ হয়ে গেল! কিন্তু বেঁচে রইলেন শুধু অটো। অসহায় বৃদ্ধ জানতেও পারলেন না, তাঁর চোখের আড়ালে কতবড় জিনিসই না ঘটে গেল!

১৯৪৫ সালে রাশিয়ানরা অটোকে মুক্ত করে দিল। আনন্দে কেঁদে ফেললেন অটো, চিৎকার করে উঠলেন, আবার আমি মুক্ত! মুক্ত অ্যামস্টারড্যামে আবার আমরা ফিরে যাব!

অটো খুঁজে বেড়ালেন মেয়ে দুটোকে আর তাঁর স্ত্রীকে। তাঁর অফিসের পুরনো কর্মচারী মিয়েপের সঙ্গে দেখা। মিয়েপ জানাল, অটো ছাড়া তাঁর পরিবারের আর কেউ বেঁচে নেই। বাজ ভেঙে পড়ল অটোর মাথায়। বৃদ্ধ জ্ঞান হারালেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে শেষ করলেন না। কারণ অ্যানকে যে আবার বাঁচতে হবে!

ফ্রাংক পরিবার ধরা পড়বার পর মিয়েপ একবার তাদের গোপন আশ্রয়ের ঘরে এসেছিল।

সেখান থেকে অ্যানের ডাইরিটা সে উদ্ধার করে

রেখেছিল। আজকে সেই পুরনো ডাইরিটা সে বৃদ্ধ অটোর হাতে তুলে দিল।

অটো পড়ে চললেন অ্যানের ডাইরি। কয়েক পাতা পড়েন আর চোখের জলে বুক ভেসে যায়। সেই ডাইরির ভেতর বৃদ্ধ খুঁজে পেলেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে। তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা হলো সেই ডাইরি।

অটো একবার তাঁর এক বন্ধুকে সেই ডাইরিটা পড়তে দিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। ডাইরিটা পড়বার পর অধ্যাপক এক পত্রিকায় সেই ডাইরিটা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। তারপর অটোকে অ্যানের ডাইরিটা প্রকাশ করবার জন্যে অনুরোধ জানালেন অধ্যাপক। প্রথমটায় অটো অরাজী হলেন, বললেন, অ্যানের ডাইরি আমার ব্যক্তিগত সম্পদ—সকলের জন্যে নয়।

অধ্যাপক জানালেন, এই ডাইরি অনেক উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে। এর মানবিক আবেদন সর্বজনীন, ব্যক্তিবিশেষের নয়। পৃথিবীতে অনেক রাজনীতিজ্ঞ, অনেক সাহিত্যিক, অনেক মনীষী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁদের কণ্ঠ সোচ্চার করেছেন। কিন্তু ঐ ডাইরির কয়েক পাতায় অ্যান যুদ্ধ সম্পর্কে তার যে মতামত প্রকাশ করেছে তা অনবদ্য।

শেষ পর্যন্ত ডাইরিটা প্রকাশ করতে রাজী হলেন অটো। কিন্তু প্রকাশক কই? শেষে অধ্যাপকের চেষ্টায় একজন প্রকাশক ডাইরিটা প্রকাশ করতে রাজী হলেন। বইটির নাম দেওয়া হলো 'অ্যান ফ্রাংকের ডাইরি'। প্রথম মুদ্রণে বিক্রী হলো দেড় লক্ষ কপি। মুদ্রণের পর মুদ্রণ চলল। ব্রিটেনের বাজারে বিক্রী হলো আড়াই লক্ষ কপি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রী হলো সাড়ে চার লক্ষ কপি। পৃথিবীর প্রায় বিশটি উন্নত ভাষায় অনূদিত হলো অ্যান ফ্রাংকের ডাইরি।

প্রত্যেক বছর অ্যানের জন্মদিনে তখন দেশ-বিদেশ থেকে অটোর কাছে অভিনন্দন পত্র আর উপহার আসছে। এক ওলন্দাজ মহিলা ভাস্কর উপহার দিলেন অ্যানের পূর্ণাঙ্গ একটি মূর্তি। ইংলণ্ডের এক বিখ্যাত স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী অটোকে বললেন, আপনার কাছে এটা নিশ্চয়ই খুব আনন্দের যে, নিজের সব দুঃখ দিয়ে আজ আপনি বুঝতে পারছেন যে, অ্যানের জীবন প্রকৃত পক্ষে এইবার শুরু হলো।

পাশ্চাত্য দেশগুলোর বিভিন্ন শহরে অ্যান ফ্রাংকের ডাইরির নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হলো। এক ভদ্রলোক নাটক দেখবার পর অটোকে চিঠি লিখলেন, আমি মনে করতাম যে, আমি একজন বড়ো দরের নাৎসী। কিন্তু সে দিন রাতে নাটকটা দেখবার আগে পর্যন্ত আমি নাৎসী কথার প্রকৃত ভয়ংকর অর্থটা জানতাম না।

অ্যান ফ্রাংকের ডাইরির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ফ্রান্সিস্ গুড্রিচ এবং অ্যালবার্ট হ্যাকেট্। নাটকটি পুলিট্জার পুরস্কার পেয়েছিল। ইংলণ্ডের ফয়েনিক্স নাট্যশালা দীর্ঘ ছ মাস কাল ধরে নাটকটি মঞ্চস্থ করেও দর্শকদের দাবি মেটাতে পারেন নি। বিখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিবেশক টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী-ফক্স অ্যান ফ্রাংকের ডাইরি অবলম্বনে একটি চিত্র নির্মাণ করেন।

অটো দেশ-বিদেশ থেকে অনেক অভিনন্দন পত্র, অনেক উপহার পান। সে-সবের ভেতর থেকে একজন জাপানী কিশোরীর লেখা একটি চিঠি তিনি যত্ন করে তুলে রাখেন। মেয়েটি লিখেছিল, ডাইরিটা পড়তে পড়তে নিজেকে ভুলে গেছলাম। মনে হলো, আমিই সেই অ্যান। একজন অ্যান চলে গেছে, কিন্তু আমি তো আছি—আরও কতো অ্যান থাকবে। অ্যান শেষ হতে পারে না!

টুকরো হাসি—একটু হাসো!

—আশীষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[রাণু আর দীপুর মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া লেগেছে]

রাণু ॥ রাস্কেল, তোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে।

দীপু ॥ একটা চোখ উপড়ে ফেল, তাহলে আর একচোখে দেখতে পারবি।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
স্কুল ছুটির পরে
আমি একটা দারুণ দূরবীন বানিয়েছি ফন্টে! তোকে দিয়েই উদ্বোধন করাবো।
চোখে লাগিয়ে দ্যাখতো আমাকে দেখতে পাস কিনা?
কইরে নন্টে! কিচ্ছুই তো দেখতে পাচ্ছি না!
দেখবি, দেখবি! দূরবীনটা আর একটু উঁচু কর তাহলেই দেখবি।
কই কিচ্ছুই তো— আলগ্!
এতক্ষণে তাহলে দেখতে পেয়েছিস! হিঃ হিঃ!
এটা কি হলো নন্টে?
দূরবীনটা তুই উদ্বোধন করলি ফন্টে— হাঃ হাঃ হাঃ!
আমাকে দিয়ে উদ্বোধন করিয়েছিস, এবার এটা দিয়ে তোকে শোধন করিয়ে দিচ্ছি— ওকি!
গেল, গেল বেচারা!
অন্ধ ভিখিরিটার পেছনে খ্যাপা ষাঁড়!

শিগগির চ'লন্টে! ষাঁড়টাকে না থামালে গুঁতিয়েই অন্ধ বেচারাকে পটলডাঙ্গায় পাঠিয়ে দেবে।
ফন্টে! অন্ধ বেচারাকে আমি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।
গুড! আমিও তোর দুরবীন দিয়ে এক ঘা জমিয়েছি!
ঠাই!
ষাঁড়ের কবল থেকে আমায় বাঁচালে! তোমরা দীর্ঘজীবী হও।
টং!
হতচ্ছাড়া বিটকেল! দেখোচ্ছি।
এর মানে কি ফন্টে?
হিঃ হিঃ! ডাণ্ডা মারলুম ষাঁড়ের মাথায় আর আব গজালো তোর!
তুই ইচ্ছে করে করেছিস। সব তোর চালাকি!
আমার চালাকি, না তুই চালাকি করে আমার গায়ে কালি লাগিয়েছিস।
পাড়ায় আসিস, মাথায় ডবল আব গজিয়ে ছেড়ে দেবো।
তুই আসিস, বার্নিশ করে ছেড়ে দেবো।

মহাকাল রায়

১লা মার্চ :

স্কুলে আর কলেজে ইতিহাসই ছাত্রটির সবচেয়ে প্রিয় পাঠ্যবিষয়।

ইউরোপের ইতিহাস পড়তে পড়তে তিনি মুগ্ধ তন্ময় হয়ে যান। ছোট-বড় নানা ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে গোটা মহাদেশের এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির উত্থানপতনের কাহিনী—রয়েছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত। যুগ যুগ ধরে এই ইতিহাস, এই কাহিনীমালা যাঁরা লিখে রেখে গেছেন, তাঁদের রচনার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে জাতির প্রতি ও দেশের প্রতি তাঁদের গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা।

কিন্তু ভারতবর্ষের ও বাংলাদেশের এমন ইতিহাস কই? বিদেশী শাসকেরা ভাড়াটে লেখকদের দিয়ে পদানত ভারতবর্ষের যে ইতিহাস লিখিয়েছেন, সে ইতিহাসে আর যাই থাক, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাস্তব ছবি নেই কোথাও। এমন ইতিহাস পড়ে কোনও দেশের কোনও ছাত্র নিজের মাতৃভূমিকে ঠিকমত চিনতেই পারবে না, ভালবাসা তো দূরের কথা।

ছাত্র-জীবনেই তাই তরুণটি সংকল্প করেছিলেন, তিনি দেশের প্রকৃত ইতিহাস লিখবেন। লিখবেন বাংলাদেশের সত্য কাহিনী। বিদেশী ঐতিহাসিকরা যে ইতিহাসকে মিথ্যা ঘটনার রঙ ফলিয়ে বিবর্ণ করেছে, তিনি সেই জায়গায় নূতন কাহিনী ও সত্য ঘটনার আলোকপাত করবেন। দেশবাসীকে শোনাবেন তাদের পূর্বপুরুষদের অতীত কর্মকাণ্ডের অপূর্ব কাহিনী। তাই প্রথমেই তিনি লিখলেন ঐতিহাসিক কাব্য—'বঙ্গ বিজয়'। মহারাজা লক্ষ্মণসেনের বীরত্ব-গাথা শোনালেন বাঙালীকে।

এই ইতিহাসকার পেশায় ছিলেন আইনব্যবসায়ী। কিন্তু অবসর সময়ে ইতিহাস নিয়েই পড়াশুনা করতেন, পড়তেন অতীতের তাম্রলিপি, মুদ্রা এবং উৎকীর্ণ লেখমালা। ঐতিহাসিক স্থানসমূহ ঘুরে দেখতেন তিনি, সংগ্রহ করতেন ঐতিহাসিক ঘটনার কাহিনী। আর এইসব কাহিনীর সমাবেশ করতেন তাঁর রচনায়। এমনি করে তিনি একে একে লিখলেন 'রানী ভবানী', 'সিরাজ-উদ্দৌলা', 'সমরসিংহ', 'সীতারাম', 'মীরকাশিম', 'ফিরিঙ্গি বণিক' প্রভৃতি পুস্তক।

মনে-প্রাণে, কাজে ও লেখায় এই বিখ্যাত মানুষটি ছিলেন সত্যকার ইতিহাস-মানব। নাম তাঁর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। নদীয়া জেলার সিমলা গ্রামে ১৮৬১ সালের ১লা মার্চ অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

৪ঠা মার্চ

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক বক্তৃতা দিচ্ছেন। বলছেন নন্দন-তত্ত্বের খুঁটিনাটি কথা—কি ভাবে প্রতিভাধর কবি তাঁর কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন অপার সৌন্দর্য, আর সেই সৌন্দর্য-সম্পদ দেশ ও কালের গন্ডি ছাড়িয়ে সর্বজনচিত্ত মাধুর্যে ভরিয়ে তোলে।

শ্রোতার আসনে বসে রয়েছেন একটি ভারতীয় তরুণী। মুগ্ধ হয়ে শুনছেন অধ্যাপকের ভাষণ। প্রায় সাতানব্বই বছর আগের এই ঘটনা। সে সময় ভারতীয় নারী তো দূরের কথা, ভারতীয় ছাত্রও খুব কমই বিলেতে যেতেন। তরুণীটি অবশ্য ছাত্রী ছিলেন না, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে সাহিত্য-অধ্যাপকদের ভাষণ শুনতে যেতেন।

তরুণীটি হচ্ছেন তরু দত্ত। মহিলা কবি। বাঙালী

মেয়ে হয়েও তিনি ইংরাজীতে কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন ফরাসী ভাষাতেও। ফরাসী ভাষার নামকরা কবিদের কবিতার ইংরাজী অনুবাদ করেছেন। ইংরাজী ভাষায় অনূদিত এই সংকলন-গ্রন্থখানির নাম A Sheaf Gleaned in French Field.

ফরাসী ভাষায় একখানা উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। উপন্যাসের পটভূমি ফরাসীদেশ, নায়ক-নায়িকা ফরাসী। পড়বার সময় মনেই হবে না, এ উপন্যাসের রচয়িতা একজন বাঙালী তরুণী।

১৮৫৬ সালের ৪ঠা মার্চ কবি তরু দত্তের জন্ম হয়। বাবা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে বিলেত যান। মেয়েরা সেখানেই পড়াশুনা করতেন। তরু দত্ত ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করেন। তারপর কলকাতায় ফিরে তিনি সংস্কৃত ভাষাও আয়ত্ত করেন। হিন্দু দর্শনের আখ্যায়িকা নিয়েও কবিতা লিখেছেন তিনি। মাত্র একুশ বছর বয়সে ১৮৭৭ সালের ৩০শে আগস্ট যক্ষ্মারোগে মারা যান। কবি তরু দত্ত অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায় এক আশ্চর্য সম্ভাবনা।

৬ই মার্চ ঃ

ফরাসী দেশ থেকে এক ধনী ধর্মযাজক এসেছেন ইটালীর ফ্লোরেন্স শহরে। বেড়াতে নয়, এসেছেন শিল্পীর খোঁজে। ভাস্কর চাই। নতুন তৈরী চার্চ সাজাবার জন্য প্রয়োজন মর্মর-মূর্তি। যীশু খ্রীস্টের জীবনের ঘটনা নিয়ে তৈরি করতে হবে মূর্তিগুলো।

ফ্লোরেন্সের ভাস্করদের তখন খুব নামডাক।

কার্ডিন্যাল ভিলিয়ার একজন নামকরা ভাস্করকে মূর্তি তৈরি করতে অনুরোধ করলেন।

শিল্পী বললেন—আমার হাতে সময় নেই। তবে আমার এই ছাত্র আপনার কাজ করবে।

ছাত্রটি তেইশ বছরের তরুণ, চোখে তন্ময়তা!

কিন্তু কার্ডিন্যাল ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তরুণ শিল্পীর ক্ষমতায়। তরুণ শিল্পীর গুরু তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন—মাইকেলকে কাজ দিলে আপনি ঠকবেন না, কার্ডিন্যাল। ও জাতশিল্পী!

তবু মন খুঁতখুঁত করে কার্ডিনালের।

তারপর তরুণ শিল্পী একখানা মার্বেল পাথর নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। ছেনী আর হাতুড়ির আঘাতে আঘাতে তৈরি করলেন দুটি মূর্তি—ক্রুশে নিহত রক্তাক্ত মহামানব যীশুকে কোলে তুলে নিয়েছেন মা মেরী—শিল্পীর অপূর্ব সৃষ্টি সেই 'পিয়েতা' (Pieta)! শিল্প-সৃষ্টির নীচে শিল্পী নিজের নাম লিখলেন—মাইকেল অ্যাঞ্জেলো।

পিয়েতা দেখে বিস্মিত মোহিত হলেন কার্ডিন্যাল এবং আর সবাই।

এবার শিল্পীর ডাক পড়ল শহরের টাউন হলের জন্য একটা মূর্তি তৈরি করতে। পাথর কুঁদে শিল্পী তৈরি করলেন এক মূর্তি—বাইবেলের যুগের বিশাল পুরুষ ডেভিড। গলিয়াথের সঙ্গে লড়াই করতে উদ্যত। সাড়ে তের ফুট উঁচু সে মূর্তি।

মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর হাতে বোবা নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তি যেন সবাক প্রাণময় হয়ে ওঠে। শিল্পের আবেদন তাই দর্শক-মনকে মুগ্ধ করে। কিন্তু মাইকেল অ্যাঞ্জেলো কেবল ভাস্কর ছিলেন না—ছিলেন চিত্র-শিল্পীও। 'ম্যাডোনা অ্যান্ড হার চাইল্ড' ছবি এঁকে তিনি দর্শকদের অভিভূত করেন। মা মেরীর কোলে শিশু যীশু—মায়ের মুখে শান্তি ও তৃপ্তির হাসি।

সিৎটাইন গীর্জা খ্রীস্টান-জগতের ধর্মগুরু পোপের নিজের উপাসনা-মন্দির। এই গীর্জাকে সাজাবার জন্য মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর ডাক এল পোপের কাছ থেকে। গীর্জার সিলিং আর দেওয়ালে আঁকতে হবে ফ্রেস্কো—দেওয়াল-চিত্র। সেই ছবিতে বিধৃত হবে বাইবেলের কথা, ধর্মের মর্মবাণী।

মাইকেল অ্যাঞ্জেলো আঁকলেন দেওয়াল-চিত্র। ছবির বিষয় হিসাবে বেছে নিলেন 'দি লাস্ট জাজমেন্ট' —শেষ বিচারের দৃশ্য। মহামানব যীশু রয়েছেন সিংহাসনে। আর তাঁর কাছে শেষ বিচারের জন্য হাজির হয়েছে পুণ্যবান ও পাপীর দল। ধর্মগুরু পোপ এইসব চিত্র দেখে নাকি আতঙ্কে বলে উঠেছিলেন—প্রভু, আমার কাজগুলোর এমনভাবে বিচার করো না।

১৪৭৫ সালের ৬ই মার্চ টাসকেনিতে মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর জন্ম হয়। সারা জীবন তিনি শিল্পকাজের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন। ১৫৬৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী অ্যাঞ্জেলো পরলোক গমন করেন। কিন্তু আজও তিনি অমর হয়ে আছেন তাঁর শিল্প-নিদর্শনগুলির মধ্যে।

১৩ই মার্চ ঃ

অপরাহ্ন কাল।

১৮৮১ সালের ১৩ই মার্চ। সুনীল আকাশে শাদা মেঘের ভেলা। সামনে শীত-প্রাসাদ।

পিটার্সবার্গের রাজপথ নির্জন। দুধারে পপলার গাছগুলো মাথা তুলেছে আকাশে—ওরাও নীরব। রাজধানী পিটার্সবার্গের এদিকটা জনমানবহীন। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এই শীত-প্রাসাদেই থাকেন।

রাজপথ কাঁপিয়ে সুসজ্জিত রাজকীয় একখানা ঘোড়ার গাড়ী ছুটে চলেছে।

জার অপরাহ্নে গাড়ীতে চেপে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। এসময় রোজই তিনি এমনিভাবে গাড়ীতে চাপেন। সাধারণ মানুষের তাই এদিকে আসা বারণ।

বছরের পর বছর ধরে জারতন্ত্র গোটা রাশিয়াকে শোষণ করছে, শাসন করছে। দারিদ্র্য আর শিক্ষাহীনতার অন্ধকারে ধুঁকছে রুশ সাম্রাজ্যের সাধারণ মানুষ। ওরা কারখানায়-খামারে, শহরে-বন্দরে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে মরে আর তাদের পরিশ্রমের মুনাফা ব্যয় হয় রাজ-পরিবারের মানুষদের শখের জন্য কিংবা নানা ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহে অথবা বিরাট ধনিক ও জমিদারদের বিলাস-ব্যসনে। রাশিয়ার নিপীড়িত সাধারণ মানুষ তাই ভীষণ বিক্ষুব্ধ। জারের শাসন আর শোষণই যে তাদের সব দুঃখের কারণ, তা তাদের কাছে অজানা নয়। মাঝে মাঝে তাই রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে জার আর জারিনাদের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। তাই জারের ভ্রমণপথে সাধারণ মানুষের চলাচল নিষিদ্ধ।

ঘোড়ার গাড়ী ধীরে ধীরে চলেছে।

সহসা একটা পপলার গাছের আড়াল থেকে দুটি মূর্তি ছুটে বেরিয়ে এল। সজোরে হাত-বোমা ছুঁড়লঃ বুম্.....বুম্.....বুম.....!

গাড়ীখানা ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের দেহ।

ওরা দুজন নিহিলিস্ট—সন্ত্রাসবাদী!

বিপ্লবী রাশিয়ার ইতিহাসে এই দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয় একটি ঘটনা। নিপীড়িত মানুষ অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কিভাবে দুর্জয় শপথ নিয়ে আগুয়ান হচ্ছিল, এই সন্ত্রাসবাদ তারই নিদর্শন।

১৪ই মার্চঃ

পৃথিবী-জোড়া যাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি, সেই মানুষটি অবশেষে এসেছেন জাপানে, রাজধানী টোকিও-তে। তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য সারা শহর সেজেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিতদের সামনে ভাষণ দিয়েছেন উনি। রাজা, রাজনৈতিক নেতা আর হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে খানাপিনাও করেছেন। কিন্তু মন ভরেনি মানুষটির। আসল জাপানকে দেখতে চান উনি, —জাপানের সাধারণ মানুষ মজুর-কিষাণদের।

কিন্তু কি করে যাবেন উনি সেখানে—মজুর-কিষাণদের পাড়ায়? ছোট ছোট গলি-ঘুঁজি, সেখানে গাড়ী চলে না। যেতে হলে, হয় যেতে হবে মানুষ-টানা রিক্সায় আর না হয় পায়ে হেঁটে। কিন্তু এমন পৃথিবী-জোড়া খ্যাতির মানুষকে ত আর হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। সুতরাং মানুষ-টানা রিক্সার ব্যবস্থা করা হল।

রিক্সা দেখে উনি বললেন—কি হবে এই মানুষ-টানা গাড়ী দিয়ে?

—এই রিক্সা আপনাকে নিয়ে যাবে।

তিনি চমকে উঠলেন—আমাকে? না না, মানুষ হয়ে মানুষ-টানা গাড়ীতে চাপব না। হেঁটেই যাব।

সেদিন পায়ে হেঁটে টোকিও শহর ভ্রমণ করেছিলেন যে মানুষটি, তিনিই হচ্ছেন এ যুগের সবসেরা বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন। আপেক্ষিকবাদের আবিষ্কর্তা, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী আইনস্টাইন মানুষকে ভালবাসতেন—তাঁর ছিল দরদী মন। তাঁর সব যুগান্তকারী আবিষ্কার, যা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট ওলটপালট ঘটিয়েছে ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে করেছে অনেক সহজ ও দ্রুত, সেসব সম্পর্কে আলোচনা করার জায়গা এ নয়। পরে তোমরা পড়বে সেসব জটিল দুরূহ বিষয়।

জার্মানীর উলম শহরে ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ আইনস্টাইনের জন্ম হয়। জাতিতে তিনি ইহুদী। ওঁর বাবা পরিবার-পরিজন নিয়ে চলে যান ইটালীতে। তরুণ আইনস্টাইন চলে আসেন স্যুইজারল্যাণ্ডে। অফিসে কেরানীগিরি করার অবসরে তিনি পড়াশুনা করতেন—করতেন বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অবশেষে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক হলেন। তারপর এলেন মাতৃভূমিতে—হলেন জার্মানীর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৯১৬ সালে তাঁর আপেক্ষিক-বাদের তত্ত্ব প্রকাশিত হল। সাড়া পড়ে গেল বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে। তারপর ১৯২১ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন তিনি।

কিন্তু হিটলারের ফ্যাসিস্ট জার্মানী বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে প্রিয় জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য করল, কারণ তিনি যে জাতিতে ইহুদী ছিলেন! ফ্যাসিস্ট হিটলারের শাসনে জার্মানীতে জাত দেখে মানুষের সব কিছুর বিচার হত। ১৯৩২ সালে আইনস্টাইন আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন। পারমাণবিক গবেষণার জন্য তিনিই মার্কিণ সরকারকে প্রেরণা দিয়েছিলেন। অবশ্য পারমাণবিক শক্তি যে শেষ পর্যন্ত মানুষ মারার হাতিয়ারে পরিণত হবে, তা বোধহয় তখন তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। ১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল আলবার্ট আইনস্টাইন পরলোক গমন করেন।

২৯শে মার্চ ঃ

ফৌজী শহর ব্যারাকপুর।

লালমুখো টমি সেনাদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য। ছাউনিতে ছাউনিতে শলা-পরামর্শ চলছে। সারা উত্তর ভারত আগুন হয়ে আছে। নেটিভ সিপাহীরা বিদ্রোহ করার মুখে। তারা ইংরেজদের খতম করে ভারতবর্ষের বুক থেকে বিদেশী রাজ-সরকারকে তাড়াবে। হিন্দু-মুসলমান সব সিপাহী এককাট্টা হয়েছে।

বিদ্রোহের আগুন প্রথম জ্বলল ব্যারাকপুরে।

বেশ কয়েক দিন ধরে তখন প্রচার চলেছে যে, বন্দুকের টোটার মধ্যে গরু আর শুয়োরের চর্বি দেওয়া থাকে। সিপাহীদের দাঁত দিয়ে সেই টোটা কাটতে হয়। গরু আর শুয়োরের চর্বি! হিন্দু আর মুসলমানের কাছে তা ছোঁয়ার অযোগ্য! ছুঁলে জাত যায়। সিপাহী-দের মধ্যে যে অসন্তোষের আগুন ধুমায়িত হচ্ছে, তাতে এটা ইন্ধনের কাজ করল।

ব্যারাকপুরের ফৌজী শহরের সিপাহীদের মধ্যে একজন ছিলেন মঙ্গল পাণ্ডে।

ছাব্বিশ বছরের তরুণ মঙ্গল পাণ্ডে হঠাৎ ইউ-নিফর্ম পরে কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে আর কাঁধে বন্দুক নিয়ে সিপাহী-ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলেন। সেদিন ছিল ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ। হাঁকলেন—নিকাল আও, পল্টন! নিকাল আও হামারা সাথ!

ইংরেজ গোরা সৈন্যদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল ঃ সর্বনাশ! নেটিভ পল্টনরা বিদ্রোহ করেছে! মিউটিনি!

অশ্বারোহী দুজন ইংরেজ অফিসার ছুটে এল। গুলি করল বিদ্রোহী মঙ্গল পাণ্ডেকে লক্ষ্য করে। মঙ্গলও গুলি চালালেন। তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করলেন ইংরেজ অফিসার দুজনকে।

সিপাহীরা এই লড়াই দেখল। মঙ্গল পাণ্ডেকে কেউ আঘাত করল না। ইংরেজ অফিসারদের হুকুম তারা মানল না!

মিউটিনি! মিউটিনি! মিউটিনি!

এর পরই সারা উত্তর ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। হাজার হাজার সিপাহী ছাউনি ছেড়ে বন্দুক আর তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইংরাজশাসন-মুক্ত হল দেহলী। এলাহাবাদ, ঝাঁসী, মীরাট, কানপুর, লাহোর, বেরিলী, সব জায়গায় ইংরেজ সেনাদলের সঙ্গে লড়াই করল ভারতীয় ফৌজ।

শুরু হল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ এই সিপাহী বিদ্রোহ—অবিনশ্বর প্রথম ভারতীয় মহাবিদ্রোহ।

৩১শে মার্চ ঃ

রাজধানী পিটার্সবার্গ।

রয়্যাল থিয়েটারে আজ একখানা নূতন বইয়ের প্রথম অভিনয় হচ্ছে। আজকের এই বিখ্যাত নাটকটি লিখেছেন এক তরুণ নাট্যকার। ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখে এর মধ্যেই নাম করেছেন। রাশিয়ার সমাজ আর তার জীবনকে গভীরভাবে দেখেছেন তিনি।

আলোচ্য নাটকখানার নাম 'দি গভর্নমেন্ট ইন্‌স্‌পেক্টর'।

আঠারো শ ছত্রিশ সালের ঊনিশে এপ্রিলের সেই প্রথম অভিনয় রজনীতে দর্শকদের আসনে ছিলেন সম্রাট প্রথম নিকোলাস। অভিনয় দেখে বললেন—প্রত্যেকের সমালোচনা করা হয়েছে নাটকে, আমারই সবচেয়ে বেশী।

নাট্যকার অত্যাচারিত নিপীড়িত রাশিয়ার আর বিলাসী রাজতন্ত্রের ছবি এঁকেছেন তাঁর নাটকে। যারা ধনে মানে সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী, তাদেরকে ঠাট্টা করেছেন। তারা যে এক-একজন দুষ্টের শিরোমণি, তাও বলেছেন। তাই সমালোচনার ঝড় উঠল।

নাট্যকার বললেন—বাপু হে, যে-লোক নাকি কাউকে ভয় করে না, সে-লোক কিন্তু নিজেকে হাস্যাস্পদ দেখতে ভয় পায়। কেউ কেউ আছে, যারা অপরের বাঁকা নাক দেখে হাসতে রাজী, কিন্তু নিজের বাঁকা মনের চেহারা দেখে হাসতে সাহস করে না।

সমালোচনার ঝড় এবার আরো দুর্বার হয়ে উঠল।

আত্মরক্ষার জন্য এবার নাট্যকারকে দেশ ছাড়তে হল।

এই তরুণ নাট্যকার হচ্ছেন ভ্যাসিলিয়েভিচ নিকো-লাই গোগোল। ইউক্রেনের সরোচিনৎস্কি শহরে ১৮০৯ সালের ৩১শে মার্চ গোগোলের জন্ম হয়। ছাত্র-জীবনেই তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন। 'তারাস বুলবা' তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'দি ওভার কোট' সুন্দর কাহিনী। 'ডেড সোল' উপন্যাস লিখে তিনি খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের বিরাগভাজন হন। তা ছাড়া আরো অনেক বই লিখেছেন তিনি।

এর পর ম্যাথু কন্সট্যান্টিনোভস্কি নামক একজন ধর্মযাজকের পাল্লায় পড়ে গোগোলের দৃঢ় ধারণা হয় যে, তাঁর রচনায় ধর্মযাজকদের সমালোচনা করে তিনি গুরুতর পাপকাজ করেছেন। তার ফলে বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি তিনি পুড়িয়ে ফেলেন। এবং এই অবস্থায় মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেন।

• পরিচালক •
আনন্দ বর্ধন

বসন্ত

শ্যামাচরণ মিশ্র

প্রথম দৃশ্য

[মঞ্চের মাঝখানে আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে আবৃত দণ্ডায়মান মিঃ উইণ্টার অর্থাৎ শীত ঋতু। ঠাণ্ডায় কাঁপছে তার দেহ। মুখে তার বিষাদের ছায়া। তাকে এখন বিদায় নিতে হবে। জায়গা দিতে হবে বসন্ত ঋতুকে। ধীরে ধীরে সমীরবাবুর (বাতাসের) প্রবেশ।]

সমীর। এ কী বন্ধু! তুমি যে এখনও দাঁড়িয়ে? নির্বাচনে তোমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বসন্তবাবু যে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছেন—জান তো সে কথা?

মিঃ উইণ্টার। জানি। তুমি এখন তাই এসেছ! আমাকে বিদায় জানাতে, না বিদ্রূপ করতে?

সমীর। ভুল করছ বন্ধু!

মিঃ উইণ্টার। ভুল.....? (মৃদু হেসে) তোমার উপর আমার অটুট বিশ্বাস ছিল এত দিন। কিন্তু তুমি তা ভেঙ্গে দিয়েছ। তুমি বিশ্বাসঘাতক!

সমীর। ভুলে যেও না মিঃ উইণ্টার—সমীর কারও চিরদাস নয়। প্রকৃতির যা বিধান তা তোমায় মেনে নিতেই হবে।

মিঃ উইণ্টার। (সদম্ভে) আর যদি না মানি?

(বসন্তের প্রবেশ। পরনে তার সবুজ বেশ, মাথায় লাল পাগড়ি।)

বসন্ত। কেন মানবেন না মিঃ উইণ্টার?

মিঃ উইণ্টার। তার উত্তর আপনাকে দেওয়া কি আমার প্রয়োজন?

বসন্ত। মিছে উত্তেজিত হচ্ছেন মিঃ উইণ্টার।

মিঃ উইণ্টার। অনধিকার চর্চা করবেন না বসন্তবাবু। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণের অধিকার আমি আপনাকে দিই নি। আপনি যান এখান থেকে।

বসন্ত। আমায় আদেশ করছেন?

(বসন্তের চোখেমুখে ভ্রূকুটি।)

মিঃ উইণ্টার। ইয়েস্, আই ওয়াণ্ট দ্যাট্!

বসন্ত। কী! অপমান!

মিঃ উইণ্টার। তা জেনেও বারবার প্রশ্ন করার অর্থ?

বসন্ত। এ অপমানের প্রতিশোধ আমি কিভাবে নিতে পারি জানেন?

মিঃ উইণ্টার। (সহাস্যে) আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন বসন্তবাবু?

বসন্ত। (উচ্চৈঃস্বরে) গরম সিং!

(কনস্টেবল গরম সিং-এর প্রবেশ।)

গরম সিং। জী হুজুর!

বসন্ত। অ্যারেস্ট করে একে নিয়ে যাও সমুদ্রপুরীর অন্ধকার জেলখানায়।

মিঃ উইণ্টার। বসন্তবাবু!

বসন্ত। সাইলেন্ট প্লিজ্। যান!

(পর্দা নেমে এল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বসন্তবাবুর বৈঠকখানা। কয়েকজন সাংবাদিক ঘিরে বসে আছে বসন্তবাবুকে। টেবিলের ওপর

কাগজে কি সব যেন লিখছে তারা। একজন কিশোর সাংবাদিক উঠে দাঁড়াল।]

কিশোর সাংবাদিক। আমি কিশোর ভারতীর সাংবাদিক। আপনার এই মন্ত্রিত্ব লাভের পর আপনার প্রথম এবং প্রধান কাজ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

বসন্ত। আমার প্রথম এবং প্রধান কাজ হল জনগণের জড়তার মোহনিদ্রা ভাঙানো। শীতের অত্যাচারে সবাই অলস হয়ে গেছে। তাদের ডাক দিয়ে জাগিয়ে তুলব। তারপর সকলের মধ্যে প্রয়োগ করব আমার কিশলয়-সমবন্টনের নীতি। শীতের জড়তা ও অত্যাচার মুক্ত হয়ে সকল কিশোর-কিশোরী ভাইবোন জাগুক, উঠুক—এই আমার আন্তরিক কামনা।

(সাংবাদিকরা লিখে নিল এবং তারপর নমস্কার করে বিদায় নিল।)

(একটু বাদে গায়ে কালো পোশাক পরে রাজদূত কোকিলের প্রবেশ।)

বসন্ত। এই যে দূত, এস এস! স্বাগত তোমায় কোকিল। বল, রাজ্যের কী সমাচার।

কোকিল। সারা রাজ্য ঘুরে দেখলাম, জনগণ এখনও তাদের জড়তা ভাঙতে পারছে না। পলাশ শিমুল অশোক এসে গেছে, কিন্তু কৃষ্ণচূড়া এখনও কুঁড়ির কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে আরামে।

বসন্ত। তুমি আবার যাও আর প্রচার কর আমার ঘোষণা। খ্যাত-অখ্যাত সকল ফুলকে আদেশ দাও কুঁড়ির আবরণ থেকে বেরিয়ে আসতে।

(পর্দা নেমে এল।)

তৃতীয় দৃশ্য

[পর্দা উঠল। নেপথ্য থেকে ভেসে আসছে মধুর এক সঙ্গীতের সুর, ভেসে আসছে কোকিলের কুহুকুহু রব। একে একে মঞ্চে প্রবেশ করে অশোক, পলাশ, শিমুল আর কৃষ্ণচূড়া।]

অশোক। এস পলাশ, এই তো আমাদের ফুটবার সময়।

পলাশ। চল এগিয়ে। আমি শিমুলকে ডেকে এনেছি। এস ভাই শিমুল।

শিমুল। চল ভাই। এস কৃষ্ণচূড়া, এস।

(সকলের প্রবেশ। সকলের দেহ যথোপযুক্তভাবে সজ্জিত। সবশেষে বসন্তের প্রবেশ।)

(একটু বাদে তিন জন কিশোরের প্রবেশ—সৈয়দ, জয়ন্ত ও আশিস।

সৈয়দ। এই জয়ন্ত, এই আশিস, এদিকে আয়। ঐ দ্যাখ, কত ফুল ফুটেছে বনটাতে। অনেক ফুল ঝরেও পড়েছে।

জয়ন্ত। তাই তো রে!

আশিস। গাছের তলাটা যে ফুলেফুলে একেবারে লাল হয়ে উঠেছে!

সৈয়দ। আমরা রোজ এসে এখান থেকে ফুল কুড়িয়ে নিয়ে যাব।

জয়ন্ত। আচ্ছা ভাই বলতে পারিস, বসন্তকালে বসন্ত পঞ্চমীতে মা সরস্বতী এসে আমাদের কাছ থেকে কেন শুধু কুন্দফুলের মত সাদা ফুলেরই পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে যান? এই লাল লাল ফুলগুলো কি তাঁর অপছন্দ রে?

সৈয়দ। ও কথা তুই সওয়াল-জবাবের বাণীদাকে জিজ্ঞেস করিস'খন।

আশিস। তাই ভাল। আজই একটা চিঠি লিখব বাণীদাকে।

(বীরুর প্রবেশ।)

সৈয়দ। আরে বীরুদা যে!

জয়ন্ত। (এগিয়ে এসে) কোথায় যাচ্ছ বীরুদা?

বীরু। আরে তোরা এখানে? আমি তো প্রায় রোজই সকালে এদিকে বেড়াতে আসি।

আশিস। দেখ বীরুদা, আমরা কত ফুল কুড়িয়েছি।

বীরু। বাঃ, কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে তোদের হাতগুলো।

সৈয়দ। বীরুদা, তুমি একটা কবিতা শোনাবে?

বীরু। দূর্! এখন? এইখানে?

জয়ন্ত। হলই বা।

বীরু। তবে শোন্, কালকে একটা কবিতা লিখেছি, সেটাই বলি। শোন্ তবে—

এসো বসন্ত
রাঙো দিগন্ত—
নয় ফুলে কিশলয়ে,
নহে কো কোকিল-কুহু সঙ্গীতে
মলয় মারুত লয়ে!
এসো বসন্ত!
নিয়ে যুগান্ত,
বিপ্লব রাগে রেঙে!
এসো, নয় ধীরে,
দ্রুত পদ ফেলে
পুরানো পাঁজর ভেঙে!

নির্জন নদীতটে • অনিতা রায় চৌধুরী

নির্জন নদীতটে আমি একেলা,
গান গেয়ে কেটে যায় সারাটি বেলা।
উপরে আকাশতলে মেঘ ভেসে যায়,
আমার গানের সুর বহুদূর ধায়।
দূরে দেখি পাখীগুলি ফিরে যায় নীড়ে,
আমি শুধু বসে আছি নদীটির তীরে।
নির্জন নদীতট, কোথা কেহ নাই,
আমি যেন স্বপনের তরীখানি বাই।
নদীর শীতল জল লাগে পায়ে এসে,
আবার সে ফিরে যায় মৃদু হাসি হেসে।
মনে নেই কেটে গেছে কখন বেলা
নির্জন নদীতটে আমি একেলা।

ভুল

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

নিতাই মিষ্টান্ন ভাণ্ডার।

ময়লা সাইনবোর্ডে লেখা দোকানের নাম। চৌরাস্তার মোড়ে ছোট্ট একটি দোকান। কারখানায় কাজ করতে যাবার আগে আর কাজ শেষে শ্রমিকদের অধিকাংশই নিতাই মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ঢুঁ মেরে কিছু খেয়ে যায়। দোকানের মালিক নিতাই পাল। ভাল স্বভাবের লোক। দোকানের আরেকজন লোক—মধু। সে একাধারে দোকানের ময়রা ও বয়। সে না থাকলে দোকান অচল। দোকানের শুরু থেকে সে কাজ করছে। তাই এখন প্রায় ঘরের লোকই হয়ে গেছে।

সেদিন গিয়ে দেখি দোকানের সামনে একটা জটলা। কাছে যেতেই শুনলাম, নিতাই বলছে, "ওঃ এত দিন যেন দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষছিলাম। ছোঁড়াটার পেটে পেটে এত শয়তানী বুদ্ধি!"

আসল ব্যাপারটা পরে জানা গেল। দেশে বৌকে পাঠাবে বলে নিতাই দু শ টাকা আলাদা করে রেখেছিল। তার ছেলে অসুখে ভুগছে। মনটা তাই স্বভাবতই চঞ্চল। বৌ জানিয়েছে, ওষুধপত্র কেনার জন্যও বেশ কিছু টাকার দরকার। আজ সেই টাকা পাঠাতে গিয়ে নিতাই দেখে, টাকা নেই, সেই সঙ্গে মধুও নেই। বোঝা গেল, মধুই টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। থানায় খবর দেওয়া হল। কিন্তু মধুর পাত্তা পাওয়া গেল না।

এদিকে নিতাই অস্থির হয়ে উঠল। দেশের বাড়িতে ছেলেটির কি হল, কে জানে...!

এই ঘটনার প্রায় আটদশ দিন পরে হঠাৎ একদিন মধুর খবর পাওয়া গেল। রেলস্টেশনে সে বসে আছে চুপচাপ। হরিহর কি কাজে সেখানে গেছিল, তখন সে তাকে দেখেছে।

খবরটা শুনে নিতাই একটা লাঠি নিয়ে পাগলের মত ছুটল। কিছুদূর গিয়েই দেখতে পেল, কয়েকজন লোক মধুকে ধরে নিয়ে আসছে। নিতাই ধৈর্য রাখতে পারল না। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল মধুর ওপর। তারপর চালাল প্রচণ্ড মার।

পরে কি হয়েছে জানি না। পরদিন শুনলাম মধু মারা গেছে। রাগের ঝোঁকে নিতাই লক্ষ্য করেনি যে মধুর গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। সেইজন্যই মারের ধকল অসুস্থ শরীরে সহ্য হয়নি। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু তখনই কি জানি যে আরও দুঃখজনক ঘটনা অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য।

কয়েকদিন পরে খবর পেলাম নিতাই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে! তার মৃতদেহের পাশে একটা চিরকুট পাওয়া গেছে। তাতে লেখা, "আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী না। বেঁচে থাকলে একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যার শোক আমায় পাগল করে তুলত।"

পরে সব খবরটা জানা গেল। মধু টাকা চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু কি ভেবে শেষে গিয়ে উঠেছিল নিতাইয়েরই বাড়িতে। নিতাইয়ের স্ত্রীর লেখা একটি চিঠিতে সব জানা গেল। সেই চিঠিটিও ছিল নিতাইয়ের পকেটে। তাতে লেখা ছিল, ".....মধুর কাছ থেকে ঠিক সময় টাকাটা পেলাম বলেই হয়ত ছেলেটা বেঁচে গেল। মধু এ কয়দিন রাত জেগে ছেলেটার দেখাশুনা করেছে। আজ মধুকে ছেড়ে দিলাম। কয়েকদিন ধরে তার শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল, আরও কিছুদিন থেকে যেতে বলেছিলাম, কিন্তু সে শুনল না। একরকম জোর করেই চলে গেল.....।"

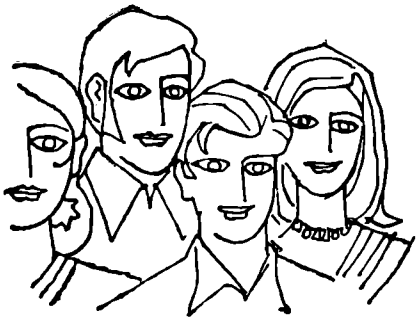

খোলা মনের মেলাতে

সুজনবন্ধু

কলিকাতা-১৪ থেকে **অমিতাভ ভট্টাচার্য** মন্তব্যসহ নতুন ধরনের একটা নীতিকথা পাঠিয়েছে আলোচনার জন্যে। সেটা এখানে তুলে দিলাম।

নীতি-কথা

এ জগতের এক সত্যি কথা বলছি শোন ভাই,
শক্তি বিনা ভক্তি পাওয়ার কোনও আশা নাই।
চাও যদি সব ভক্তি পেতে বিশ্ববাসীর কাছে,
শক্তি বাড়াও, দেখবে সবাই তোমার বশেই আছে।
ন্যায়-অন্যায় পথের মাঝে, ন্যায়েরে নিলে বেছে,
অকারণেই ঠকতে হবে, মরতে হবে শেষে।
এ জগতে সম্মানেতে বাঁচতে যদি চাও,
তবে অসৎ যত পথ আছে তা বরণ করে নাও।

প্রিয় সুজনবন্ধু, সত্যি কথা বলা কি পাপ? যদি না হয়, তবে বর্তমানের নীতি-কথা কি আমার ঐ কবিতার অনুরূপ হওয়া উচিত নয়? 'নীতি' শব্দের অর্থ যদি হিতাহিত বিবেচনাপূর্ণ উপদেশ হয় আর নীতি কথার অর্থ যদি হয় সদুপদেশপূর্ণ বাক্য, তবে আমার 'নীতি-কথা' গ্রহণীয় নয় কি? আর বিপরীত উপদেশকে যদি সদুপদেশ ভেবে অন্যকে তা পালন করতে বলো, তবে সে ক্ষেত্রে কি মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না?

ভাই অমিতাভ, তোমার রসাল কবিতা ও আলোচনাটা পড়ে বেশ আনন্দ লাভ করেছি। তেমনি তোমার বক্তব্যের সঙ্গে যদি একমত হতে পারতাম, তাহলে আনন্দটা বোধহয় ষোলকলাপূর্ণ হতো। কিন্তু পোড়া কপাল আমার, তা সম্ভব না হওয়ায় হা-হুতাশ করেই বেশ কিছুদিন কাটাতে হল।

যতটুকু বুঝেছি, তোমার বক্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় হল, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে চললে, বিশেষ করে ন্যায় পথে চললে শক্তি অর্জন করা কখনই সম্ভব নয়, আর শক্তি না থাকলে বিশ্বজনের কাছ থেকে ভক্তি পাওয়ার কোন আশাই নেই। তাছাড়া ন্যায় ও সত্য পথে চললে অকারণে ঠকতে হয় যার শেষ পরিণতি হল মৃত্যু বা ধ্বংস।

এবার দেখা যাক তোমার এই বক্তব্য কতখানি বাস্তবসম্মত ও যুক্তিগ্রাহ্য।

প্রথমেই বলে রাখি, আমার এ আলোচনা কিন্তু সমাজ ও দেশকে কেন্দ্র করে—ব্যক্তিকে নিয়ে নয়।

ইতিহাসের দিকে তাকালে কি দেখি আমরা? তোমার ঐ নীতিকথা অনুযায়ী যদি মানুষের সমাজ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হত, তাহলে মানুষের সভ্যতা কি আদিম অবস্থা থেকে এত দূর এগোতে পারত? না কি আদিম মানুষের আদিম হিংস্র বর্বরতা ও অসভ্যতাই চিরদিনের জন্য কায়েম থাকত পৃথিবীর বুকে?

ভাই, ইতিহাস বড় রসিক, তেমনি আবার নির্মমও বটে। যার যেটুকু ন্যায্য প্রাপ্য, তার চেয়ে এক কানাকড়ি বেশি সে কাউকেই দেয় না। সত্য ও ন্যায়ের উপর যার ভিত্তি, তাকে সে বড় করে ধরে, উঁচুতে স্থান দেয়, আর যা অন্যায় ও অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাকে সে ছুড়ে ফেলে দেয় নীচে জঞ্জালের স্তূপে। বারবার সে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—অসংখ্য মানুষের আদর্শবাদ, সত্যনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগই মানুষকে বড় ও শক্তিমান করেছে, এগিয়ে নিয়ে গেছে মানুষের সমাজ ও সভ্যতা।

তুমি বলেছ, ন্যায় পথে থাকলে শক্তিলাভ কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু ইতিহাস কি তাই বলে?

বেশী দূর যাবার দরকার নেই। গত প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯১৭ সালের ঘটনা। অন্যায়, অবিচার, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের প্রকাণ্ড পাহাড়ের মাথায় বসে স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্র রাশিয়া ও বিশাল রুশ সাম্রাজ্য শাসন করত। যুগ যুগ ধরে সে পাপের পাহাড় উঁচু থেকে আরও উঁচু হয়েছে, জারতন্ত্রকে মনে হয়েছে অমিতশক্তিশালী, চিরস্থায়ী। কিন্তু তা যে

সত্য নয়, ইতিহাস তা প্রমাণ করে দিল। জনসাধারণের মধ্যে ধূমায়িত হচ্ছিল যে বিদ্রোহের বহ্নি দীর্ঘকাল ধরে, তা একদিন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, বিপ্লবের আগুনের মধ্যে দিয়ে জয়যুক্ত হল মানুষের নীতিবোধ, সত্যনিষ্ঠা ও সুন্দরসুখী জীবনের প্রতি চিরন্তন কামনা। মানুষের ন্যায়নীতির শক্তি প্রাধান্য পেল অন্যায় ও অবিচারের উপর।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমসাময়িক আর একটি ঘটনা। জার্মানিতে তখন ফ্যাসিস্ত হিটলারের বিভীষিকার রাজত্ব চলেছে। দানবীয় পাপ ও অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সে শাসন। জার্মানিকে মনে হত অপরাজেয়, সর্বকালের সবচেয়ে শক্তিমান রাষ্ট্র। পৃথিবী কম্পমান তার ভয়ে। কিন্তু ইতিহাস দেখিয়ে দিলে—আজ হোক, কাল হোক, অন্যায় ও পাপের রেহাই নেই তার কবল থেকে। ইতিহাসের আবর্জনা-স্তূপে বিলীন হয়ে যেতে হল হিটলার আর তার জার্মানিকে।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে। ইংরেজের পরাধীন ভারতবর্ষ। স্বাধীনতার দাবিতে উথাল-পাথাল সারা দেশ। স্বাধীনতা ভারত-বাসীর ন্যায্য জন্মগত অধিকার। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তা মানতে রাজী নয়। ভারতবাসীর উপর তারা চালাত নির্মম শাসন, শোষণ ও অত্যাচার। তাদের মনে হত কত শক্তিমান, আর ভারতের জনগণ কত দুর্বল, কত নগণ্য তাদের শক্তি। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ বিধানে কি ঘটল শেষ পর্যন্ত? সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামের দুর্নিবার স্রোতের মুখে ভারত-ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে যবনিকার অন্তরালে চলে যেতে হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে।

এরই দু বছর পরের আর একটি যুগান্তকারী ঘটনা। চীনদেশে অন্যায় ও পাপের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল চিয়াং কাইশেকের রাজত্ব। তার বিরুদ্ধে চীনের জনসাধারণের ন্যায় যুদ্ধ চলছিল দীর্ঘকাল ধরে। শেষ পর্যন্ত ন্যায় ও সত্য জয়লাভ করল, চিয়াং কাইশেকের শাসন ভেঙে পড়ল তাসের ঘরের মত, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল ইতিহাসের চাকার তলায়।

এবার এস একেবারে বর্তমান কালে। সুদীর্ঘকাল ধরে রক্তক্ষয়ী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলেছে ভিয়েতনামের বুকে। দুই প্রতিপক্ষ—একদিকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণ ভিয়েতনাম যেমন ধনেজনে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, অনগ্রসর ও অতি ছোট গরিব দেশ, তেমনি আবার ধনেজনে, বিজ্ঞানে ও ক্ষমতায় চূড়ান্ত অগ্রসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—শক্তিমত্তায় দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে গণ্য। সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সর্ব শক্তি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ অন্যায়, মিথ্যাচার ও হিংস্র বর্বরতার সাহায্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে পদানত করতে চায়। তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনসাধারণ। তারা হাজারে হাজারে প্রাণ দিয়েছে, আজো দিচ্ছে। তাদের এ যুদ্ধ ন্যায় যুদ্ধ—সত্য ও অকলঙ্ক দেশপ্রেম তাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তাই অত বড় শক্তিধর যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তাকে আজ দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষদের হাতে মার খেয়ে খেয়ে পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে হচ্ছে। ইতিহাস চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে, এ যুদ্ধে জয়লাভ করা তার পক্ষে অসম্ভব।

ভাই, সমাজে, সংসারে, দেশে ও বিদেশে কার কত-খানি শক্তি, কে কতখানি প্রকৃত শক্তিমান, তা বুঝতে হলে আমাদের দৃষ্টিকে আরো একটু প্রসারিত করা দরকার, বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ফেলে তাকে বিচার করা দরকার, দেখা দরকার সে শক্তি কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত—ন্যায়ের উপর, না অন্যায়ের উপর।

ইতিহাস থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই, তা হল—অন্যায় ও অসত্যের উপর দাঁড়িয়ে কোন শক্তিই বেশী দিন টিঁকতে পারে না। কিছুকালের জন্য তা হয়ত মানুষকে ভয় দেখাতে পারে। কিন্তু ভক্তি? তা সে কখনই পায় না। এ কথা রাষ্ট্রের বেলায় যেমন সত্য, তেমনি সত্য সমাজের বেলায়ও। আজ হোক, কাল হোক, একদিন তাকে চলে যেতে হবেই, সাধারণ মানুষের ঘৃণা, ক্রোধ ও বিদ্রোহের আগুনে পুড়ে মরতে হবে তাকে। এমনি অসংখ্য ঘটনা, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে লড়াইয়ের কাহিনী ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের বুকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তোমার প্রতিপাদ্য বিষয় সঠিক নয়, ইতিহাসগ্রাহ্য সত্যও নয়।

তবে তোমার সঙ্গে আমি একমত যে, সমাজে, দেশে ও দুনিয়ায় আজ কোথাও দুর্বলের স্থান নেই। এজন্য একান্ত দরকার শক্তি অর্জন করা। কিন্তু অন্যায়, অসত্য ও অত্যাচারকে ভিত্তি করে যে শক্তি, তার কি পরিণতি ঘটে তা আমরা দেখেছি। তাই ন্যায় ও সত্যের পথে সেই শক্তিই আজ আমাদের অর্জন করতে হবে, যা জনসাধারণের আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালবাসা ও সহযোগিতাকে ভিত্তি করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে জগৎসভায়। এটাই মঙ্গলকর প্রকৃত শক্তি—স্থায়ী ও অপরাজেয়।

পরিচালক ঃ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

এবার শব্দ-হেঁয়ালির পরিবর্তে কয়েকটি ধাঁধা দেওয়া হল। তোমরা এগুলোর উত্তর ২৮-৩-৭০ তারিখের মধ্যে আমাদের কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেবে।

আগামী চৈত্র সংখ্যায় এই ধাঁধাগুলির উত্তর প্রকাশিত হবে।

১। ছেলেকে নিয়ে অক্ষয়বাবু মাছের বাজারে গিয়ে দেখলেন, মাছওয়ালা তিনভাবে তার মাছগুলো জলসমেত বিক্রি করছে। অর্থাৎ মাছ আগে জল পরে, মাছ ও জল একসঙ্গে অথবা জল আগে মাছ পরে কিনতে হবে। অক্ষয়বাবু কিছুতেই ঠিক করতে পারলেন না, কিভাবে কিনলে তিনি ঠকবেন না। যাই হোক, ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত মাছ আর সেইসঙ্গে খানিকটা জল তাঁকে কিনতে হল। কিন্তু এভাবে কিনেও তিনি অন্যান্য ক্রেতাদের চেয়ে বেশী লাভবান হলেন।

তোমরা বলতে পার, তিনি কিভাবে মাছ ও জল কিনেছিলেন এবং কেন অন্যান্য ক্রেতাদের চেয়ে বেশী লাভবান হয়েছিলেন?

[ইন্দ্রনাথ মুখার্জী, চিত্তরঞ্জন]

২। বেড়াচ্ছিল উড়ে সে যে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে,
পা-টি তাহার কেটে দিলেম হঠাৎ তাকে ধরে।
একটা মশার লেজটা ছিঁড়ে, জুড়ে দিলেম যেই,
ময়রা সেজে বেচতে মেঠাই চলে গেল সে-ই॥

[সৈয়দ আহসান জমিল, মুর্শিদাবাদ]

৩। ঠিক একরকম দেখতে আটটি লোহার বল আছে। সেগুলোর মধ্যে একটি বল ওজনে মাত্র ২ গ্রাম বেশী। কিন্তু ওজন না করে কেউই বলতে পারবে না, কোন্ বলটি ওজনে বেশি।

দাঁড়ি-পাল্লার সাহায্যে মাত্র দুবার ওজন করে বলতে পারবে কি, কোন্ বলটি ওজনে বেশি?

কিভাবে বলা যায়, বল ত?

[বিতানকুমার ঘোষ, জলপাইগুড়ি]

৪। জন্ম হলে মৃত্যু হবে—
জানে যে সবাই।
গয়া কাশী বেড়িয়ে এলাম,
ভয় যে মোদের নাই।
দীনে দয়া করব মোরা—
এই তো ভীষণ পণ,
শরীরটাকে গড়তে হবে,
অটুট সবল মন।
চার অক্ষর বলে দিলাম,
শেষ দুটি নাও চন্দ্র থেকে;
ছয় মিলে যাঁর নামটি আছে,
তোমরা কি ভাই জান তাঁকে?

[ইন্দ্রজিৎ দাশগুপ্ত, বাগনান]

গত মাসের শব্দ-হেঁয়ালির উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম

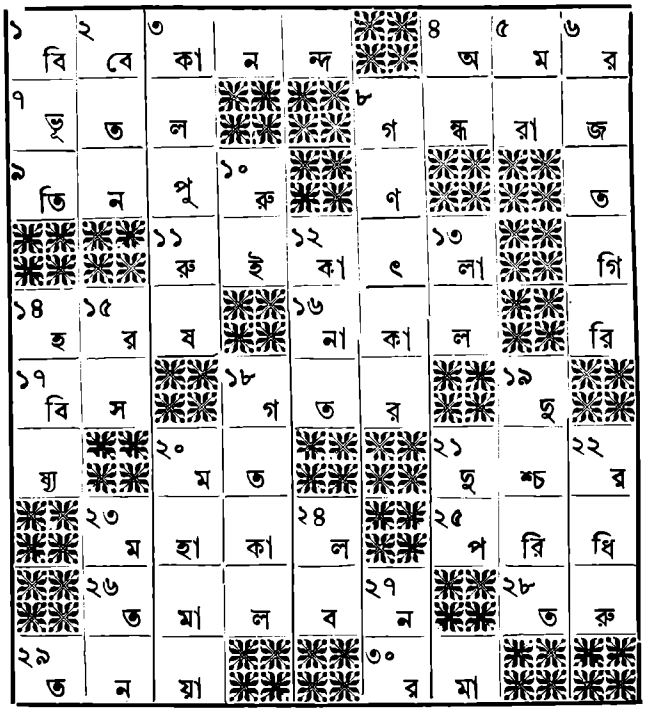

গত মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত শব্দ-হেঁয়ালিটি সহজ হওয়ায় অনেক বন্ধুই সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে। এটা নিঃসন্দেহে সুখবর। আমরা উত্তরদাতা-বন্ধুদের নাম নিচে প্রকাশ করছি।

সবগুলোই নির্ভুল

অসীম ও অসিত পুরকাইত, মানখণ্ড; বেবী, ছবি, তাপস, মানস, কণা ও টুকটুকি, ডিমডিমা চা বাগান; ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক, কলিকাতা ৬; কাজলকুমার নিয়োগী, কলিকাতা ২৪; সৌমিত্র সিংহ, গড়িয়া; শমিতকুমার ভাদুড়ী, নয়াদিল্লী ৩; বাসুদেব সেন, গড়িয়া; শঙ্করলাল সাহা, শ্রীরামপুর; বিদ্যুৎ, প্রদ্যোৎ, নীরেন ও সুবীর, লধুড়কা; রবি, জলধর, সুনীল, চৈতন ও অশোককুমার তন্তুবায়, রামকানালী; প্রসূন ও মনীষা দাশ, রামপুর; চতুরকুমার কবিরাজ, দুবরাজপুর; সুজিতকুমার সরকার, কলিকাতা ৪; ভূপেন চন্দ্র দে, সৈয়দ আহসান জমিল, কাঞ্চন, তরুণ ও চন্দন দে, গোকর্ণ; অরুণ, অশোক, কল্যাণ, চিত্রা, মিত্রা ও শুভ্রা ভট্টাচার্য, মাশিলা; পিনাকী চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ৬; শিশির ও শ্যামল মোদক, বাঁশবেড়িয়া; অমরেন্দ্র, চন্দন, ইন্দ্রজিৎ ও প্রদ্যুৎ, চিত্তরঞ্জন; সৌমিত্রকুমার চক্রবর্তী, সালিখা; শ্যামলকুমার চক্রবর্তী, শ্রীকান্ত সেন ও অমল সাহা, জাঙ্গীপাড়া; সুদর্শন সিংহ-রায়, জাঙ্গীপাড়া; সত্য, রুমা, শঙ্কর, রত্না, স্বপ্না, কৃষ্ণা, রুবা ও সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, হাওড়া; প্রসূন ভট্টাচার্য, মাইথন; কানু, রাজা, ভোদা, পটল, কুমুদ ও তোতন ঢোল, ধানবাদ; সিদ্ধার্থ, গৌতম, স্বাতী ঘোষ ও তাপস বোস, কলিকাতা ৯; শিবাংশু, শমিতা ও শৌভিক দে, জামসেদপুর ৪; ভাস্বতী ভট্টাচার্য, নিউ দিল্লী ৫; অঞ্জন দে, দেবব্রত ও দেবাশিস পাল, কামাখ্যাগুড়ি; স্বরূপকান্তি ঘোষ, কলিকাতা ৫০; অমিতাভ রায়, কলিকাতা ১০; গৈরিক চন্দন ও রজত শঙ্কর মাইতি, কলিকাতা ৯।

এক বা ততোধিক ভুল

অরুণাভ রায়, কটক; পিনাকী, শিখর, স্বাতী রায় ও তাদের বাবা এবং মা, বারুইপুর; চন্দ্রমৌলি ব্যানার্জী, কলিকাতা ২৫; আশিস্‌কুমার দত্ত, কলিকাতা ৫৪; অমিতাভ চক্রবর্তী, জিয়াগঞ্জ; বিকাশ, অশোক, চিত্তরঞ্জন, ইতু ও রীতা ঘোষ, পুরুলিয়া; সৌমিত্র চৌধুরী, মালদহ; অনিমেষ রায়, তার মা ও জেঠিমা, কলিকাতা ২০; তপনজ্যোতি, স্বরূপা ও দেবজ্যোতি মিত্র, কলিকাতা ৩৭; ফাগুরাম সোরেন, কালিকাপুর; দ্বিজেন্দ্র নাথ সরকার ও দিলীপ চৌধুরী, জামসেদপুর ৫; শীলা ও কপিল, কৃষ্ণনগর; রঞ্জনা ও শুভ্রজ্যোতি, রাঁচী; চন্দন জোয়ারদার, বিবিগ্রাম রোড; সৌমিত্র সেনগুপ্ত, কুচবিহার; সোমা সেন, কলিকাতা ৬; মমতা চক্রবর্তী, দমদম জংশন; মিন্টু, মন্টু, সোনা, মনা ও কুমকুম, বাঁকুড়া; দেবব্রত ও সুব্রত ঘোষ, কাঁকিনাড়া; এলা, লীলা, শীলা, ইলা ও ছোট্টু, একবালপুর; রমা ও লিলি দাস, কলিকাতা ৯; স্বপনকুমার ঘোষাল, হীরালাল সেন, শক্তিময় চ্যাটার্জী ও গণেশ চক্রবর্তী, দক্ষিণেশ্বর; সুমন, কল্যাণ ও বেবী দত্ত, সেনপাড়া; পিন্টু চৌধুরী, তার বাবা ও দাদা, সোদপুর; গোবিন্দবল্লভ বাগ, দেগঙ্গা; অরুপরতন খাসনবীশ, পুরুলিয়া; উমা সেনগুপ্ত, কলিকাতা ২৮; মেঘবরণ, তার মা ও বাবা, কোন্নগর।

তুমি কি কেবলি ছবি…

মনোরঞ্জন ঘোষ

কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে অনন্ত জিজ্ঞাসা—"তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা?.....তুমি কি সত্য নও?"

সৃষ্টির আদিমকাল থেকে মানুষ ছবিকে প্রাণহীন মনে করতে ইচ্ছুক নয়। কবির ভাষাতেই সে যেন দৃঢ় কণ্ঠে বলতে চায়—"কী প্রলাপ কহে কবি? নহে, নহে, নও শুধু ছবি।"

মানব-মনের ভাব প্রকাশের জন্যে একদা ভাষা সৃষ্টি হয়েছিল। কথিত ভাষায় কাছের মানুষকে মনের কথা জানানো যেত। দূরের মানুষের জন্যে সৃষ্টি হয়েছিল লিখিত ভাষা। লিখিত ভাষার ভিত্তি হচ্ছে লিপি বা অক্ষর। কিন্তু অক্ষর আবিষ্কারের আগেও মানুষ লিখনের সাহায্যে মনোভাব প্রকাশ করত। অবশ্য তাকে লিখনের চেয়ে অঙ্কন বলাই শ্রেয়।

মানুষ লিখতে শিখার আগেই আঁকতে শিখেছে। প্রাচীনকালের গুহা-মানবদের সেই সব ছবি নিয়ে পণ্ডিতরা অনেক গবেষণা করেছেন তাদের জীবন-যাত্রা সম্পর্কে। সেসব বিষয় এখানে আলোচ্য নয়। সেই ছবিগুলির আর একটি দিক নিয়েই আমার বক্তব্য।

প্রথম যুগের সেই গুহাবাসী মানুষরা মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে শুধু রেখা বা রংয়ের মধ্যেই নিজেকে সীমিত করতে চায়নি, কয়েকটি ছবি এঁকেই সেদিন সন্তুষ্ট থাকেনি। মনের আবেগে আঁকা ছবিতে তারা প্রাণের স্পন্দন ও বেগ সঞ্চার করতে চেয়েছিল।

স্পেনদেশের আলতামিরা গুহায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আঁকা বন্য শূকরের ছবিতে দেখা যায় চারটির পরিবর্তে আটটি পদ। স্পষ্ট বোঝা যায়, শিল্পী আট পা-ওয়ালা অদ্ভুত অবাস্তব প্রাণী অঙ্কনের প্রচেষ্টা করেনি, সে চিত্রে আনতে চেয়েছিল জীবনের স্পন্দন ও গতি—গতিশীলতার প্রতীক হচ্ছে অতিরিক্ত পদগুলি। ধাবমান জীবন্ত শূকর সম্বন্ধে মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিল অজ্ঞাত শিল্পী।

পঁচিশ হাজার বছরের পুরানো এই ছবি দেখে কবির ভাষায় আমরা বলতে পারি—"কে বলে রয়েছে স্থির রেখার বন্ধনে, নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?"

মানুষের মনে গতিকে—চলমান জীবনকে—প্রকাশ করার বাসনা বহু প্রাচীন। তারই ফলে হয়েছে চিত্রকে চলচ্চিত্র করে তোলার প্রয়াস। এই প্রয়াসের ইতিহাস যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে টের পাই যে, খ্রীষ্ট জন্মাবার পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে যবদ্বীপে চলচ্চিত্র 'ছায়াছবি' রূপে প্রচলিত ছিল। বর্তমানকালের চলচ্চিত্রের সঙ্গে এই ছায়াছবির আত্মীয়তা শুধু একটি পর্দার মাধ্যমেই, আর কোন যোগ নেই। কারণ ক্যামেরা বা ফিল্ম তখনকার মানুষের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

যবদ্বীপবাসীরা মহিষের চামড়া দিয়ে নানা ধরনের প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করত। তারপর সেই চামড়ার মূর্তি-গুলি লাঠির ডগায় আটকে সূর্যের আলোতে ধরে একটি পর্দায় প্রতিবিম্বিত করত এবং এই ভাবে দর্শকদের ছায়ানাটক প্রদর্শন করত।

পরবর্তীকালে চীনদেশেও এই ধরনের ছায়া-নাটকের প্রচলন হয়।

ছায়াচিত্র হতে চলচ্চিত্রের যুগে উত্তরণের পিছনে আছে বহু বিজ্ঞানীর অবদান। 'জনে জনে রচি গেল অনিত্যের নিত্য-প্রবাহিনী।' কাজেই চলচ্চিত্র আবি-ষ্কারের কৃতিত্ব কোন একজন মাত্র বিজ্ঞানীর নয়।

অজ্ঞতাবশতঃ অনেকে বিজ্ঞানী এডিসনকে এই কৃতিত্বের অনেকখানি অর্পণ করেন। কিন্তু তা নয়। চলচ্চিত্র নির্ভরশীল হচ্ছে প্রধানতঃ তিনটি বস্তুর উপর —চিত্র-গ্রহণ যন্ত্র বা ক্যামেরা, চিত্রপ্রক্ষেপণ যন্ত্র বা প্রোজেক্টার, চিত্রধারক পদার্থ বা ফিল্ম। ক্যামেরা ও

ফিল্ম নির্মাণের পিছনে যাঁদের অবদান সব চেয়ে বেশি —মাইব্রিজ ও ফ্রিজ গ্রীন, তাঁদের কথা আগেই বলেছি।

এবার প্রক্ষেপণ-যন্ত্র নির্মাণে যাঁরা প্রয়াস করেছিলেন, তাঁদের কথা কিছু বলা যাক।

ব্যক্তিবিশেষের গল্প বলার আগে ইতিহাসের পাতা একটু ওলটালে আশা করি কারও খারাপ লাগবে না।

গুহামানব যখন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সমাজ সৃষ্টি করল, সভ্যতার পত্তন করল, তখন থেকেই নাট্যাভিনয়, পুতুলনাচ ইত্যাদির মাধ্যমে জীবন ও সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন সর্বসমক্ষে তুলে ধরার প্রচেষ্টা হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আঙ্গিকে এগুলি পরিবেষিত হতে থাকে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালীতে এমন একজন মানুষ জন্মালেন, যিনি শুধু সেই যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীই ছিলেন না, ছিলেন ভাস্কর, আবিষ্কারক, বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার। অসামান্য প্রতিভাবান এই মানুষটির নাম হচ্ছে লিওনার্দো দা ভিন্সি। তিনি শিল্পের মধ্যে, চিত্রের মধ্যে বাস্তবতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে ইচ্ছুক হন। তাই চতুষ্পার্শ্বের বাস্তব জীবনের ছবিকে তিনি যান্ত্রিক কৌশলে ধরে রাখার উপায় ভাবতে শুরু করলেন। তিনি চাইলেন, তাঁর স্টুডিওর দেওয়ালে বা টেবিলে বাইরের পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রতিবিম্বিত হোক, যার কিছু কিছু তিনি রঙে ও রেখায় তাঁর ছবি আঁকার ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলবেন। চলমান জীবনকে চিত্রের মধ্যে সার্থক-ভাবে প্রতিফলিত করার বাসনায় তিনি শুধু জীবিত প্রাণীদের অ্যানাটমির চর্চা করে ক্ষান্ত হননি, ডাক্তারদের মতো ডিসেকশান অর্থাৎ মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদও করেছিলেন —প্রাণীদেহের প্রতিটি মাংসপেশীর সংস্থান ও গতি-ভঙ্গী বা মুভমেন্ট সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানার্জনের আশায়।

এই বাস্তবানুরাগী কৌতূহলী শিল্পী-বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছিলেন যে, যদি কোন অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তবে সেই রশ্মি বহির্দৃশ্যকে প্রতিবিম্বিত করতে সক্ষম। এই-ভাবে আধুনিক ফটোগ্রাফী প্রচলিত হবার পূর্বেই তিনি তাঁর স্টুডিওর দেওয়ালে বাইরের ছবি প্রক্ষেপ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। লিওনার্দো দা ভিন্সির স্টুডিও হয়েছিল চলচ্চিত্রের সূতিকাগার।

পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডঃ এণ্টনিও ফার্ডিনাণ্ড প্লেটো চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য তিনিই প্রথম একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করেছিলেন। যন্ত্রটির নাম হচ্ছে ফেনেকিস্‌টোস্কোপ। অবশ্য তাঁর আগে বিখ্যাত বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে, স্যার জন হার্শেল, ডঃ ফিটন ও অ্যাথানাসিয়াস কির্চার চলচ্চিত্র নিয়ে কিছু কিছু গবেষণা করেছিলেন।

ডঃ প্লেটোর সময় ম্যাজিক-লণ্ঠনের প্রচলন হয়েছে। ১৮৭০ সাল থেকে ম্যাজিক-লণ্ঠনের সাহায্যে শিল্পীদের আঁকা ছবি পর্দায় প্রতিফলিত করে দর্শকদের দেখানো হত। ডঃ প্লেটো প্রথম চিন্তা করেন আঁকা ছবির বদলে দর্শকদের ফটোগ্রাফ দেখানোর কথা।

অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, চলচ্চিত্রের দ্বারা দর্শকদের নয়নরঞ্জন করে আনন্দদানে যিনি ব্রতী হলেন, ভাগ্যের পরিহাসে তিনি ছিলেন দৃষ্টিশক্তিহীন অন্ধ—নিজের আবিষ্কারে আনন্দলাভের সৌভাগ্যে বঞ্চিত! আঠাশ বছর বয়সে চোখের পর্দার (রেটিনা) উপর সূর্যালোকের প্রভাব পরীক্ষাকালে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তাতে তিনি নিরুৎসাহিত হন না। সম্পূর্ণ অন্ধ হবার ছ বছর পরে আত্মীয়-বন্ধুদের সাহায্যে, তাদের নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে করিয়ে তিনি তাঁর চলচ্চিত্র প্রদর্শনের যন্ত্রটি নির্মাণ করেন। এই যন্ত্রটিতে চোখ লাগিয়ে উঁকি মেরে চলচ্চিত্র দেখা যেত।

প্রকৃত চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণকারীর গৌরব কিন্তু তাঁর প্রাপ্য নয়, কারণ স্বচ্ছ পদার্থের উপর ছবি তুলে লেন্স ও আলোর দ্বারা প্রতিফলন করতে তিনি সমর্থ হননি। তাঁর কৃতিত্ব দর্শকদের সামনে আঁকা ছবির বদলে ফটো-গ্রাফকে নিয়ে আসার।

যাই হোক, তিরাশী বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অদম্য উৎসাহে তিনি চলচ্চিত্র সম্বন্ধে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এই মানুষটির যদি দৃষ্টিশক্তি থাকত, তাহলে চলচ্চিত্রের জন্ম-ইতিহাস হয়ত অন্যরকম হয়ে যেত।

এই অন্ধ মানুষটির সঙ্গে সঙ্গে আর একজন হারিয়ে-যাওয়া মানুষের কথা মনে আসে। চলচ্চিত্রের ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম মুছে না গেলেও, তিনি অকস্মাৎ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যান পৃথিবীর বুক থেকে তাঁর নির্মিত আশ্চর্য যন্ত্রটিসমেত।

আবিষ্কারের গল্প স্থগিত রেখে এই আবিষ্কারকের গল্পই আপাততঃ একটু শোনানো যাক।

১৮৯০ সালের শরৎ কাল। ফ্রান্সের দিজঁ স্টেশনে প্যারিসে যাবার ট্রেনটা থামতে একজন উচ্চশ্রেণীর এক কামরায় উঠে বসলেন। সঙ্গে রয়েছে এক বিরাট সিন্দুক

আর আমেরিকা যাবার পাসপোর্ট। ভদ্রলোকের নাম লুই ল্য প্রিন্স। নামে যেমন প্রিন্স চেহারাও তেমনি প্রিন্সের মতন, ভিড়ের মধ্যেও সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দীর্ঘদেহী—ছ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা। ফরাসী সরকারের এক উচ্চপদস্থ অফিসারের সন্তান। প্যারিসের কলেজে পড়াশোনা করেছেন, লিপ্‌জিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার চর্চা করেছেন। শিল্পচর্চার ঝোঁক থাকায় ইতালী ও দক্ষিণ ফ্রান্সের বহু স্থানে ভ্রমণ করেছেন। ইংল্যান্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করেছেন। যখন ফ্রান্সের সঙ্গে প্রুশিয়ার যুদ্ধ বাধে এবং প্যারিস শহর অবরুদ্ধ হয়, তখন স্বদেশে ফিরে তিনি সৈন্যদলে যোগ দেন মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য। যুদ্ধ থামলে ইংল্যান্ডের লিডস শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। লিডসে তিনি এক আর্ট স্কুল স্থাপন করে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে শিক্ষকতা শুরু করেন।

তারপর তাঁর শ্যালক জন হুইটলির সঙ্গে কি যেন এক আবিষ্কারের নেশায় মত্ত হয়ে পড়েন এবং তারই পরামর্শ মতো আমেরিকা যাবার জন্য প্রস্তুত হন।

গুজব রটে যায়, তিনি এমন এক যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন, যেটা নিয়ে সে-সময়কার বড় বড় বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাচ্ছেন। যিনি এই যন্ত্রটি প্রথম নির্মাণ করতে পারবেন, তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জনে সক্ষম হবেন। কারণ বড় বড় ব্যবসায়ীরা গোপনে এই আবিষ্কারের প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছেন। ফলে ল্য প্রিন্সকে খুব গোপনীয়তার সঙ্গে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়, পাছে তাঁর পেটেন্ট নেওয়ার **আগে** অন্য কেউ তাঁর কলা-কৌশল আয়ত্ত করে পেটেন্ট **নিয়ে** নেয়। এমন কি যে মিস্ত্রীকে দিয়ে তিনি নক্সা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করান, **তাকেও** ঘুণাক্ষরে জানান না, কি যন্ত্র সে বানাচ্ছে।

যাই হোক, তিনি নিউইয়র্ক যাত্রা করার আগে কয়েক সপ্তাহ তাঁর ছোট ভাইয়ের কাছে কাটাতে এসেছিলেন। ভাই বিদেশ-যাত্রার সময় দাদাকে স্টেশনে তুলে দিতে এসে অবাক হয়েছিল দাদার সঙ্গের বিরাট ঐ তোরঙ্গটি দেখে। সেটি তার দাদা এক মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টির আড়ালে করতে রাজী নন, ট্রেনের লগেজ ভ্যানে সেটি না তুলে নিজের কাছেই রেখেছেন।

ল্য প্রিন্সের কাণ্ড দেখে ভাই হেসে বলে, ওটা কি ট্রেজার-আইল্যান্ডের সেই গুপ্তধনের সিন্দুক নাকি?

ল্য প্রিন্সও হেসে জবাব দেন, হ্যাঁ, গুপ্তধনেরই সিন্দুক! মহা সম্পদ এতে আছে। এর দৌলতে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক আমি শীগ্‌গীরই হব।

ছোট ভাই দাদার হেঁয়ালিভরা কথা বুঝতে পারে না, ভাবে দাদা তার সঙ্গে পরিহাস করছে। শিল্পীবিজ্ঞানীরা খেয়ালী হয়, তাই তাঁদের কথাবার্তা একটু অদ্ভুত।

ট্রেন ছেড়ে দেয়। তারপরেই ল্য প্রিন্স শুধু ভাইয়ের চোখের আড়ালেই চলে যান না, সকলেরই চোখের আড়ালে একেবারে চিরকালের জন্যই চলে গেলেন। তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। প্যারিসে তাঁকে পাওয়া যায় না, নিউইয়র্কেও তিনি পৌঁছান না। তাঁর আত্মীয়-স্বজন, ফ্রান্সের গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে সর্বত্র খুঁজে বেড়িয়ে বিফল হয়। জলজ্যান্ত লোকটা ভোজবাজির মত হাওয়ায় মিলিয়ে গেল!

পুলিশের অনুমান, কোন বদমাইশ লোক হয়ত তাঁর মুখ থেকে অমনি হেঁয়ালিভরা কথা শুনে ভেবেছিল, যে তাঁর সিন্দুকে অমূল্য সম্পদ আছে। বদমাইসটা মনে করেছিল, সোনাদানা অলঙ্কারের গুপ্তধনে সিন্দুক বোঝাই। তাছাড়া ল্য প্রিন্সের চেহারাও ছিল লর্ড-ব্যারন বা রাজপুত্রদের মত। ফলে তাঁকে খুব ধনী ব্যক্তি ভেবে গোপনে হত্যা করে তাঁর দেহ সিন নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সিন্দুক খুলে হতাশ হয়ে বদমাইশটা সেটাও নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। কারণ সিন্দুকে টাকাকড়ির বদলে ছিল অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি আর ফিল্মের বাক্স।

পৃথিবীর প্রথম আবিষ্কারকের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছিল তাঁর আবিষ্কৃত চলচ্চিত্রের যন্ত্রপাতি। কেবল তাঁর আবিষ্কারের সাক্ষী হিসাবে ছিল ছজন মাত্র লোক, যাদের তিনি লিডসে তাঁর কারখানায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেছিলেন। আর ছিল তাঁর নিজের কন্যা, যে হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম শিশু চলচ্চিত্র-দর্শক।

কন্যার কথায় জানা যায় যে, সে একদিন বাবার গবেষণাগারে ঢুকেছিল তাঁকে খাবার-ঘরে চা খেতে ডাকার জন্য। কিন্তু গবেষণাগারে পা দিয়েই সে দেখে, সাদা দেওয়ালে কয়েকটা ছায়া নড়াচড়া করছে আর তার বাবা অন্ধকার ঘরে একটা যন্ত্র নিয়ে কি যেন করছেন। ভৌতিক কাণ্ড কারখানা ভেবে সে ভীষণ ভয় পেয়ে চুপিচুপি সেই ঘর থেকে পালিয়ে আসে।

আবিষ্কারক সেদিন টের পাননি শিশু-দর্শকের উপস্থিতি। আজও তার জের চলেছে নাকি? আজও কি চলচ্চিত্র-নির্মাতারা টের পান না প্রেক্ষাগৃহে শিশু-দর্শকদের উপস্থিতি? তাহলে তাদের উপযোগী চলচ্চিত্র তাঁরা নির্মাণ করেন না কেন?

বিজ্ঞানীর দপ্তর

• পরিচালক •
কিশোর বিজ্ঞানী

ম্যাজিক স্কোয়ার বা যাদুবর্গ

অমরনাথ রায়

'ম্যাজিক স্কোয়ার' বা 'যাদুবর্গ' কাকে বলে জান? সে বড় মজার জিনিস।

যাদুবর্গের সংখ্যাগুলো ওপর থেকে নীচে, পাশাপাশি, কিংবা কোনাকুনি—যে দিক থেকেই যোগ কর না কেন, যোগফল সব সময় একই রকম হবে। যেমন, নীচের ১নং যাদুবর্গের অন্তর্গত সংখ্যাগুলোর যোগফল সব দিক থেকেই ৩২।

১	৮	৯	১৪
১১	১২	৩	৬
৭	২	১৫	৮
১৩	১০	৫	৪

১নং যাদুবর্গ

এই যে যাদুবর্গ, এর প্রথম আবির্ভাব ঘটে কবে, বা কে প্রথম যাদুবর্গ আবিষ্কার করেন, তা কিন্তু জানা যায় না। তবে যাদুবর্গ যে অতি পুরনো জিনিস, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ খ্রীষ্ট জন্মের হাজার বছর আগে রচিত চীনা পুঁথিতে এর উল্লেখ আছে।

যাদুবর্গের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এর উৎপত্তির মূলে আছে মানুষের নানা রকম সংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা ও অন্ধ বিশ্বাস। অনেক যাদুবর্গই রোগের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে কিংবা ভূত-প্রেত-দত্যি-দানা তাড়াবার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছে।

সেকালের সাধারণ মানুষের অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে, যাদুবর্গের অলৌকিক শক্তি আছে। আমাদের দেশে অনেকেই তাই ধাতু বা পাথরের ওপর যাদুবর্গ খোদাই করে মাদুলির মত পরে থাকতেন। সেকালের অনেক জ্যোতিষীও বলতেন যে, যাদুবর্গের ঘর-পূরণের সঙ্গে নাকি গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগ আছে। তাই মানুষের শুভ-অশুভ এই যাদুবর্গ গঠন ও ধারণের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। এ কালের কেউ যাদুবর্গের এই অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী কিনা, জানি না। তবে সেকালে এর অলৌকিক শক্তিতে অনেকেই যে বিশ্বাসী ছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। এ রকম যাদুবর্গ সেকালে অনেক মুদীর দোকানে দেওয়ালের গায়ে আঁকা থাকতে দেখা যেত। কিন্তু কেন?—কারণ সেসব যাদুবর্গ নাকি ছিল সৌভাগ্যসূচক। দোকানে তা আঁকা থাকলে দোকানীর ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হবে, তার ভাগ্য যাবে ফিরে, এটাই ছিল বিশ্বাস।

গোয়ালিয়র দুর্গের দ্বারদেশে ২নং যাদু-বর্গটি খোদাই করা ছিল। দুর্গ ছিল যে রাজার, তিনি নাকি বিশ্বাস করতেন যে, ঐ যাদুবর্গ তাঁর দুর্গকে অপরাজেয় করে রাখবে চিরকাল।

১৫	১০	৩	৬
৪	৫	১৬	৯
১৪	১১	২	৭
১	৮	১৩	১২

২নং যাদুবর্গ

যে দিক থেকেই ২নং যাদুবর্গের সংখ্যাগুলো যোগ কর না কেন, যোগফল সর্বদাই হবে ৩৪।

৩নং যাদুবর্গটির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। লক্ষ্য করো, এতে দু রকম ঘর পূরণ করা আছে। গোটা যাদুবর্গের অন্তর্গত সংখ্যাগুলোর যোগফল ৬৫, কিন্তু এর ভেতরকার মোটা দাগ দিয়ে ঘেরা ছোট বর্গের যোগফল ৩৯।

৪নং যাদুবর্গটি একটু অন্য ধরনের।

এই যাদুবর্গের অন্তর্গত সংখ্যাগুলোর **গুণফল** সব দিক থেকেই ৪০৯৬।

২৩	১	২	২০	১৯
২২	১৬	৯	১৪	৪
৫	১১	১৩	১৫	২১
৮	১২	১৭	১০	১৮
৭	২৫	২৪	৬	৩

৩নং যাদুবর্গ

৮	২৫৬	২
৪	১৬	৬৪
১২৮	১	৩২

৪নং যাদুবর্গ

যাদুবর্গের তো কয়েকটা উদাহরণ দিলাম।

এখন তোমরা বাড়ীতে বসে নিজেরা চেষ্টা করে দেখ—মাথা খাটিয়ে নতুন কোন যাদুবর্গ তৈরি করতে পার কিনা।

ছোট্ট তিনটি জাদুর খেলা

• পরিচালক •

কিশোর জাদুকর

॥ এক ॥

তোমরা নিশ্চয়ই ম্যাজিক দেখতে খুব ভালবাস। নয় কি? তোমরা যে কেউ একটু চেষ্টা করলে, আমার এই ছোট্ট খেলাটি অতি সহজে প্রদর্শন করে বন্ধুদের আনন্দ দিতে পারবে।

খেলাটি হল, জাদুকর একটি রুমাল নিয়ে জ্বলন্ত প্রদীপ বা মোমবাতির উপর ধরলেন—রুমালটিকে পুড়িয়ে ছাই করার জন্য। কিন্তু কি আশ্চর্য! রুমালটি মোটেই পুড়ল না।

এবারে খেলার কৌশলটা শিখিয়ে দিচ্ছি। হাঁসের ডিমের শ্বেত অংশের সঙ্গে খানিকটা ফিটকিরি ভাল-ভাবে মিশিয়ে নাও। তাতে একটা রুমাল ভিজিয়ে নিয়ে সাধারণ জলে ধুয়ে ছায়াতে শুকোতে দাও। এবার রুমালটা তৈরী হয়ে গেল। এখন ওটাকে জ্বলন্ত প্রদীপ বা মোমবাতিতে ধরে দেখ—মোটেই পুড়বে না।

—**জাদুকর রঞ্জনকুমার**

॥ দুই ॥

পথে-ঘাটে যে সব বেদেরা ম্যাজিক দেখায়, তারা সবার সামনে বড় বড় কাঁচ মুখে পুরে কড়মড় করে রাক্ষসের মতো চিবিয়ে গুঁড়ো করে। অদ্ভুত ব্যাপার। এটা কিন্তু তোমরাও করতে পার। আশ্চর্য লাগছে তো?

প্রথমে কাঁচটাকে আগুনে ভালভাবে গরম করে নেবে। তারপর আদার রসে সেই কাঁচকে একটু ডুবিয়ে দাও। দেখবে, কাঁচ নরম হয়ে যাবে। আর তখন একটু আদা চিবিয়ে কাঁচগুলো নির্ভয়ে মুখে পুরে চিবোতে শুরু করতে পার।

তবে হ্যাঁ, কাঁচগুলো যেন সাঁত্যকারের নরম হয়। নইলে.....সে এক বিশ্রী ব্যাপার! ঠিকমত দেখাতে পারলে সব্বাই কিন্তু অবাক হবে।

—**সৈয়দ আহসান জমিল**

॥ তিন ॥

এবার তোমাদের একটা ছোট্ট অথচ খুবই মজার জাদু-বিদ্যার কথা বলব। যে কোন আসরে এমন কি স্টেজেও এই খেলাটা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করতে পারবে।

জাদুকর এক প্যাকেট তাস এনে টেবিলের উপরে দুভাগে ভাগ করে উপুড় করে রাখলেন। তারপর দর্শকদের একজনকে বললেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রথম ভাগের একখানা তাস নিয়ে তিনি দ্বিতীয় ভাগের তাসের মধ্যে ঢুকিয়ে ভালভাবে শাফ্‌ল্‌ করে দিন। একথা বলে জাদুকর স্টেজের ভিতরে চলে গেলেন। আর সেই দর্শকও ঐ ফাঁকে জাদুকরের নির্দেশমত কাজ সারলেন। তাসের ভাগ দুটো কিন্তু উপুড় করাই থাকবে।

এরপর জাদুকর ফিরে এসে দ্বিতীয় ভাগের তাস-গুলো একবার দেখেই দর্শকদের মনোনীত তাসটি, যেটা প্রথম ভাগ থেকে দ্বিতীয় ভাগে ঢোকান হয়েছিল, বের করে দিলেন।

কিভাবে করলেন, জান? জাদুকর এক প্যাকেট তাস আগে থেকেই জোড় আর বিজোড় সংখ্যায় ভাগ করে রেখেছিলেন। অর্থাৎ, জোড় সংখ্যায় ২, ৪, ৬, ৮, ১০ এবং Q বা ১২, আর বিজোড় সংখ্যায় A বা ১, ৩, ৫, ৭, ৯, J বা ১১ এবং K বা ১৩ থাকবে। জাদুকর এইভাবে তাসগুলোকে ভাগ করে প্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখেন এবং যখন বের করে টেবিলের উপর রাখলেন, তখনও ঐভাবে দুভাগে ভাগ করে রাখেন।

এরপর বাকী অংশটা খুবই সোজা। দর্শকরা এক-ভাগ থেকে যে তাসটা অপর ভাগে দিলেন, সেটা ঐ অপর ভাগের সঙ্গে মিলবে না। অর্থাৎ যদি ভাগটা জোড়ের থাকে, তাহলে ঐ তাসটা বিজোড়ের হবে। আবার যদি ভাগটা বিজোড় হয়, তাহলে তাসটা জোড়ের হবে। এবং জাদুকর সহজেই তাসটা চিনে নিতে পারবেন।

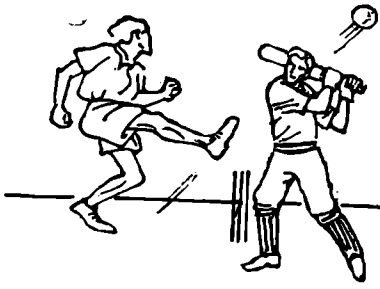

খেলাধুলা

ব্যাটিং করার গোড়ার কথা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

পিটিয়ে খেলে রান তোলার কায়দার কথা আমরা গত সংখ্যায় আলোচনা করেছি। এবার আমরা শিখবো কভার ড্রাইভ করার কায়দা। কভার ড্রাইভ করা খুব যে সহজ, তা নয়। নিখুঁতভাবে কভার ড্রাইভ করতে হলে দিনের পর দিন চালাতে হবে অনুশীলন।

সব কটি ড্রাইভ করার কায়দা মোটামুটি একই ধরনের। যেটুকু তফাৎ, তা শুধু মাত্র ঐ বলের ডিরেকশনের বা গতিপথের ওপর নির্ভর করে। যাই হোক মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, হাফ ভলী বলই ড্রাইভ করার পক্ষে আদর্শ। ড্রাইভ করার কারণ হলো, ব্যাটসম্যান এই মারগুলোর সাহায্যে বলটাকে মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে বাউণ্ডারিতে পাঠাতে পারে। ব্যাটের বুক অর্থাৎ ব্লেড দিয়ে বলটা মারা হয়। কিন্তু বলটা মারার সময় ব্যাটের হ্যাণ্ডেলটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকবে, ব্যাটটা কিছুতেই খাড়া বা লম্বভাবে থাকবে না।

কভার ড্রাইভের বেলায় ব্যাটসম্যান কিন্তু বলটা সোজাসুজিভাবে ব্যাটের বুক অর্থাৎ ব্লেড দিয়ে মারবে না। কভার ড্রাইভের সময় ব্যাটসম্যান তার হাতের ব্যাটটাকে কভারের দিকে একটু কাৎ করে রাখবে। এই সময় ব্যাটসম্যানের বাঁ-কাঁধ আর বুক, এমন কি ব্যাটে-বলে সংযোগ হবার সময়ও, বুক থাকবে অফের দিকে। বলটা মারার পর ব্যাটটা ব্যাটসম্যানের কাঁধের ওপরে চলে যাবে আর সেই সঙ্গে ব্যাটসম্যানের শরীরটাও আস্তে আস্তে ঘুরে যাবে বাঁ দিকে।

ব্যাটটা উঠে যাবে তার বাঁ কাঁধের ওপরে। তার

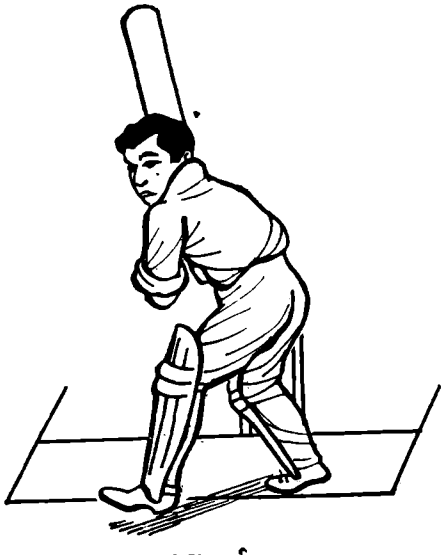

১নং ছবি

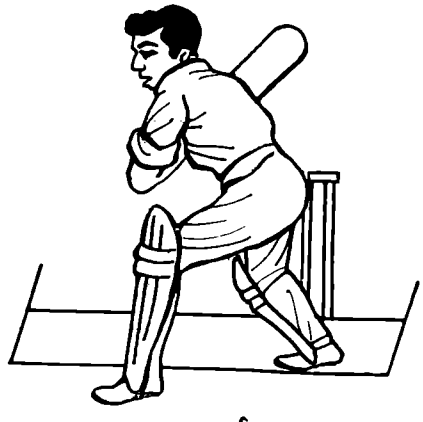

২নং ছবি

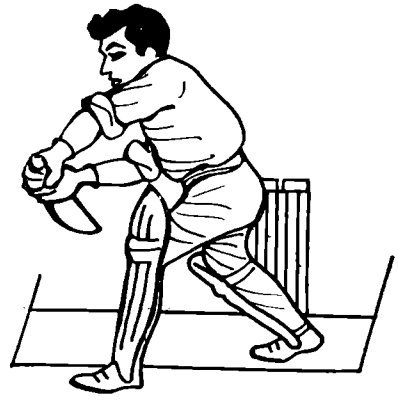

৩নং ছবি

মাথা আর বুক ঘুরে যাবে বোলারের দিকে। ডান পায়ের টো শুধু মাত্র মাটি ছুঁয়ে থাকবে।

এইবার এই প্রবন্ধের সঙ্গে ছাপা ছবিগুলো দেখা দরকার। ছবিগুলো দেখে মিলিয়ে নিতে হবে ব্যাট তোলার কায়দা অর্থাৎ ব্যাকলিফট, তারপর বলের লাইনে পা দিয়ে ব্যাট নামিয়ে আনা, এরপর ব্যাট দিয়ে বলটাকে মারার পদ্ধতি, ফলোথ্রু আর সবশেষে বলটা মারার পর ব্যাটসম্যানের শরীরের অবস্থার বিষয়। সেইভাবে দিনের পর দিন অনুশীলন করে যেতে হবে।

প্রথম কয়েক দিন মারটা কিছুতেই ঠিকমত হতে চাইবে না। কিন্তু এই লেখা পড়ে আর এই লেখার সঙ্গে ছাপা ছবিগুলো মিলিয়ে অনুশীলন করলেই কভার ড্রাইভ করায় হাত পেকে যাবে। তখন কভার ড্রাইভ করার মতো একটা হাফভলী বল পেলে আর দেখতে হবে না। ব্যাটসম্যান নির্ঘাৎ কভার ড্রাইভ করে বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে দেবে সেই বলটা।

কভার ড্রাইভ ক্রিকেট খেলার অন্যতম সুন্দর আর দর্শনীয় মার। এই শটটি নিখুঁতভাবে মারতে পারলে ব্যাটসম্যান যত না খুশী হবে, তার চেয়ে অনেক বেশী খুশী হবেন দর্শকরা।

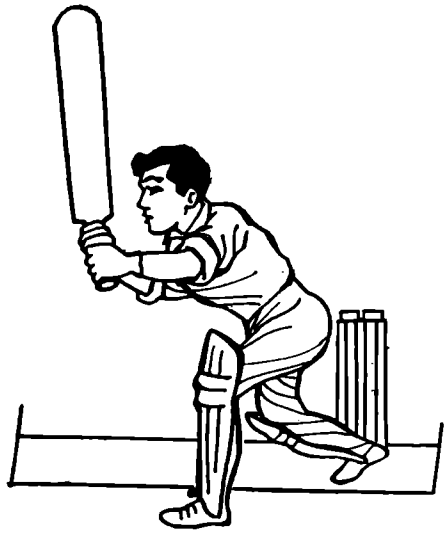

৫নং ছবি

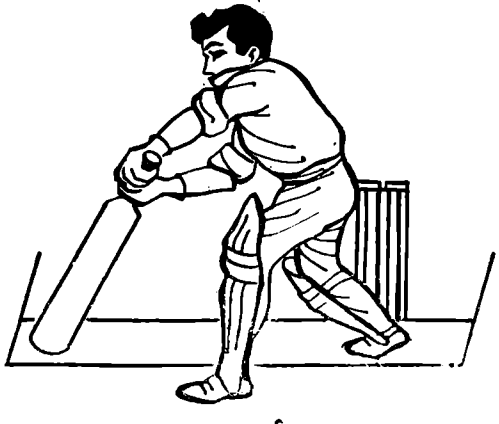

৪নং ছবি

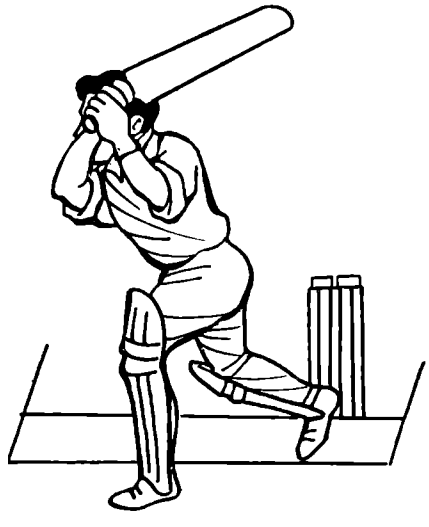

৬নং ছবি

খেলার জগতের নানা খবর ॥ বিশ্বনাথ

খেলোয়াড় পরিচিতি ঃ প্রসন্ন

এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের দুই স্পিন বোলার প্রসন্ন আর বেদীকে রাষ্ট্রপতি পদ্মশ্রী খেতাব দিয়ে সম্মানিত করেছেন। বর্তমান ভারতের সেরা অফ ব্রেক বোলার এরাপল্লি অনন্তরাও শ্রীবাস প্রসন্ন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। প্রসন্নর বলের লেংথ, ডিরেকশান আর অ্যাকিউরেসি অতুলনীয়। দেশ-বিদেশের নামকরা ব্যাটসম্যানরাও প্রসন্নর বলে ঠিকমতো খেলতে পারেন না, তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যান। তাই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রসন্ন অর্জন করেছেন টেস্ট খেলায় শততম উইকেট দখল করার কৃতিত্ব। প্রসন্নর জন্ম ১৯৪০

সালের ৫ই মে। পেশায় তিনি ইঞ্জিনিয়ার। মাত্র কদিন আগে কলকাতার সীমা মিত্রকে বিয়ে করেছেন। কথা ছিল বিয়ের পরই ওঁরা লন্ডনে চলে যাবেন আর সেখানেই চাকরি করবেন প্রসন্ন। কিন্তু ব্যাঙ্গালোরে একটা ভালো চাকরি পাওয়ায় বিলেত যাওয়া তিনি বাতিল করে দিয়েছেন। আমরা আশা করবো, আরো অনেক দিন ধরে খেলে বিশ্ব-ক্রিকেটের দরবারে প্রসন্ন ভারতের মুখ উজ্জ্বল করবেন।

মজার ঘটনা

ক্রিকেট খেলায় ওভার বাউন্ডারি অনেকেই মারেন। কিন্তু ওয়ারউইকশায়ারের রেভারেন্ড জে. এইচ. পার্‌সনের মতো আর কেউ ওভার বাউন্ডারি মেরে অমন অভাবনীয় নজীর সৃষ্টি করতে পারেন নি। এ অবশ্য অনেক দিন আগের ঘটনা—১৯২৮ সালের কথা। সেবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ এসেছে ইংলন্ড ভ্রমণে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলার সময় পার্‌সন্‌ একটা ওভারে পর পর চারটে ওভার বাউন্ডারি মেরে সকলকে থ করে দিলেন। কিন্তু পার্‌সনের মারা একটা ওভার বাউন্ডারি ততক্ষণে নেপথ্যে যে কি কান্ড করে বসেছে, তখনো তা কেউ জানতেও পারেন নি।

পার্‌সনের মারা বলটা তখন শূন্যে ভেসে বাউন্ডারির ওপর দিয়ে সোজা চলে গেছে প্যাভেলিয়নের ভিতরে—খাবার ঘরে। খাবার ঘরে তখন এক ভদ্রমহিলা বসে বসে চা খাচ্ছিলেন। চায়ে চুমুক দেবার জন্যে তিনি কাপটা কেবল তুলেছেন, এমন সময় দমাস্‌!—বলটা এসে সজোরে কাপের ওপর পড়লো। এবং বলের সঙ্গে কাপটা গেল ছিটকে। ভদ্রমহিলার হাতে রইল শুধু কাপের ডাঁটিটা! তাঁর চা খাওয়া ততক্ষণে মাথায় উঠেছে, চক্ষুও চড়কগাছ!

খেলার আসর • সাংবাদিক

ভারত ভ্রমণ শেষ করে অস্ট্রেলিয়া এখন খেলতে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া দলটি যে খুব একটা শক্তিশালী নয়, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার খেলার ধারা দেখে। অস্ট্রেলিয়া ভারতের বিরুদ্ধে ৩-১ টেস্টে জিতে রাবার লাভ করেছে। কিন্তু ঐ জয়লাভের কৃতিত্ব কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা দাবী করতে পারেন না। ভারতীয় খেলোয়াড়দের বিশেষ করে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতাই অস্ট্রেলিয়ার সাফল্যের কারণ। একমাত্র বম্বের প্রথম টেস্ট ছাড়া প্রত্যেকটি খেলায় ভারতীয় বোলাররা অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের তুর্কী নাচন নাচিয়ে ছেড়েছিলেন। তাই দেখা গেল, অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে যতটা শোনা গিয়েছিল, তাঁরা ঠিক ততটা নন। তা যে নন, তার আরও প্রমাণ হলো দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার খেলার ফলাফল। অস্ট্রেলিয়া সেখানে মোটে দাঁড়াতেই পারছে না। প্রথম দুটি টেস্টের দুটিতেই অস্ট্রেলিয়া হেরে ভূত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় টেস্টে তো আবার ইনিংসে পরাজয়। দেখা যাক, বাকী টেস্টগুলিতে কি হয়।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে এখন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে খুব গোলমাল চলেছে। চলাই স্বাভাবিক। কারণ আজ আর কেউই দক্ষিণ আফ্রিকার অন্ধ বর্ণ-বৈষম্য নীতির অর্থাৎ কালোচামড়ার মানুষদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করার নীতির কাছে মাথা নীচু করতে রাজী নয়। তাই এ বছর দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দলের ইংলন্ড ভ্রমণ করা হবে কিনা, কে জানে! টেনিসেও দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা কাহিল। ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় সম্ভবতঃ তাদের আর অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। খেলাধুলায় বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ কিংবা আন্তর্জাতিক জগতে খেলাধুলার মূল্য বা গুরুত্ব যাঁদের কাছে কিছু নয়, গায়ের রংটাই সব, তারা অপরের কাছ থেকে কি আশা করতে পারে? এবার বোধহয় দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাই খেলাধুলার জগতে একঘরে হয়ে থাকতে হবে এবং এটাই তার উচিত শাস্তি। সেইজন্যে অস্ট্রেলিয়া দল দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে ভাল করেন নি।

আর তার সঙ্গে তাল দিতেই যেন চেক টিম ব্রাতিশলাভা এসেছিল কলকাতায়। আই. এফ. এ.'র সঙ্গে একটা খেলায় অংশ গ্রহণ করে তারা জিতে যায় ৩-১ গোলে। আই. এফ. এ. সেদিন পুরো শক্তি নিয়ে মাঠে নামে নি। তবু চেক দলের খেলা দেখে মন ভরে নি। সাধারণ স্তরের খেলার মতই সে খেলায় না ছিল আকর্ষণ, না ছিল উত্তেজনা। তবে এ কথা ঠিক যে, চেক দল সব দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে অনেক ভালো। দিনের পর দিন অনুশীলনের পর তারা নিজেদের গড়ে পিটে তৈরি করে নিয়েছে। কিন্তু আমরা সে-তুলনায় শুধু পিছিয়েই নেই, ক্রমশঃ আরো বেশী পিছিয়ে পড়ছি।

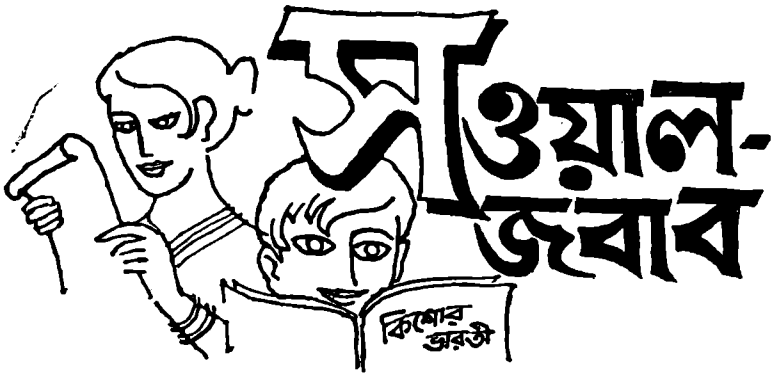

বাণী মৌলিক

চঞ্চলকুমার চক্রবর্তী, গৌহাটি

—একটি জিনিসের অভাব বোধ করছি কিশোর ভারতীতে। তা হল বিপ্লবী জীবনকথা। সেগুলি যদি কিশোরদের সম্মুখে তুলে ধরতে পারেন, তবে তাদের চরিত্রগঠনে এটা একটা conducive factor হবে।

ঃ মূল্যবান পরামর্শ—আমরা সানন্দে গ্রহণ করছি।

—চিত্তরঞ্জনের শতবার্ষিকী উপস্থিত। এই শতবার্ষিকীতে তাঁর একটি ধারাবাহিক জীবন-কাহিনী প্রকাশ করলে, আশা করি, সমস্ত পাঠক বন্ধুদের কাছে ভাল লাগবে।

ঃ এটাও দামী কথা। ধারাবাহিক না হোক, স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন-কাহিনী প্রকাশের চেষ্টা করা হবে।

রেবা দাস, দুর্গাপুর

—অনায়াসে বলা যায় যে, কিশোর ভারতী কিশোর-কিশোরী কেন, সকল বয়সের লোকের একটি উৎকৃষ্টতম মাসিক পত্রিকা। ইহার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ঃ সবাই তাই বলে, আর তার ফলে আমরা আরো উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করি।

—মাটি পুড়িলে রং পরিবর্তন করিয়া লালচে হয় কেন?

ঃ উত্তাপের ফলে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, তার জন্যই এই পরিবর্তন।

বাণী বসু, নবগ্রাম

—কিশোর ভারতীতে 'ইতিহাসের দিনলিপি'র সংযোজনটি সুন্দর। এতে জ্ঞানের ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হবে বলেই আশা করি। খেলাধুলার বিভাগ এবং বিজ্ঞানীর দপ্তরও নিঃসন্দেহে সুন্দর।

ঃ খুশির কথা।

—আচ্ছা, খোলামনের মেলাতে কি আমরা সবাই যোগ দিতে পারি?

ঃ অবশ্যই, তবে বেশ খোলামেলা মন নিয়ে।

—ইংরাজী সাহিত্যে অগাধ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের আস্বাদন দিতে সমর্থ এমন কারো সাথে পত্রমিতালী করতে চাই। আমার বয়স আঠারো, বিজ্ঞানের ছাত্রী, সাহিত্যিক অনুসন্ধিৎসা প্রবল।

মানস দত্ত, ডিমডিমা

—"বোধ হয় যা নেই ভারতে—তা আছে শারদীয়া কিশোর ভারতীতে", এই মন্তব্যটি পূর্ণ সার্থকতা লাভ করল বিপুল আলোড়ন জাগিয়ে শারদীয়া কিশোর ভারতী প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে। প্রত্যেকটি জিনিসই চমৎকার-ভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

ঃ চমৎকার! চমৎকার!

—আমাদের স্কুলে এতদিন রাজনীতি বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, আমাদের স্কুল তথা সমস্ত অঞ্চলটাতেই রাজনীতির বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। এর পরিণাম কি ভাল, না খারাপ?

ঃ গত সংখ্যার কিশোর ভারতীর 'খোলামনের মেলাতে' সুজনবন্ধু এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পড়েছ আশা করি।

কুমার চন্দন রায়, কুচবিহার

—এ পর্যন্ত কি ক্যানসার রোগের কারণ এবং তাহার ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে? কোন এক পত্রিকায় পড়িলাম যে, হিমালয় অঞ্চলে 'কুত' নামক কোন এক উদ্ভিদের দ্বারা এই রোগের ঔষধ হয়, আর সেই প্রত্যাশায় অন্য দেশ ঐ স্থান হইতে ঐ গাছ তাহাদের দেশে লইয়া গিয়া পরীক্ষা চালাইতেছে। যদি ভারতবর্ষেই এই মূল্যবান বস্তুটি জন্মে, তবে কি ভারতীয় বিজ্ঞানী দপ্তর ইহা লইয়া পরীক্ষা চালাইতে পারেন না?

ঃ ক্যানসার রোগের সঠিক কারণ আজ পর্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি—যদিও সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে ও বিপুল অর্থব্যয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি প্যারিসের এক খবরে বলা হয়েছে যে, 'ক্যানসার ভাইরাস' বা ক্যানসার রোগবীজের দেখা পাওয়া গেছে। তবে ওষুধ আজো তেমন কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। নানা-রকম রশ্মির সাহায্যেই চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ এখনো সম্ভব হচ্ছে না। 'কুত' নামক গাছের সাহায্যে যেমন ওষুধ তৈরির চেষ্টা চলছে, তেমনি চেষ্টা চলছে আরও বহু গাছ ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে। ভারত-বর্ষে 'কুত' গাছ পাওয়া যায় সত্য, আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরাও চেষ্টা করছেন তা থেকে ওষুধ তৈরি করতে। কিন্তু এইসব গবেষণা খুব ব্যয়সাধ্য—অনেক টাকার দরকার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যদি ওষুধ তৈরির জন্য এই গাছ নিয়ে গবেষণা চালায়, তাতে ক্ষতি কি? ওষুধ তৈরী হলে গোটা পৃথিবীরই ত কল্যাণ হবে, অসীম উপকার হবে

মানবজাতির। কাজেই যেখানেই এ ধরনের প্রচেষ্টা হোক না কেন, তা কি সর্বদা সমর্থনযোগ্য নয়? অবশ্য আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা যদি সবার আগে ওষুধটা আবিষ্কার করতে পারেন, তবে তা হবে আমাদের পক্ষে খুবই গৌরবের ও আনন্দের বিষয়।

নীহাররঞ্জন ভৌমিক, হরিপাল

—ঝকঝকে লাইনো টাইপে আগাগোড়া মুদ্রিত, বহুরঙা ঝলমলে প্রচ্ছদে শোভিত, বহু রঙিন ও একরঙা ছবিতে ভরপুর থাকে কিশোর ভারতীর প্রতিটি সংখ্যা। এটা তো বেশ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এত ব্যয়ভার বহন করে কিশোর ভারতীর স্থায়িত্ব কিভাবে সম্ভব?

ঃ কিশোর ভারতীকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চাই নিরবচ্ছিন্ন প্রচার। আর এই প্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম তোমরাই। তোমাদের কাছে আমরা তাই বারবার আবেদন জানিয়ে আসছি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, স্কুল-কলেজ ও ক্লাব-পাঠাগারে, সকল পরিচিত জনের কাছে কিশোর ভারতীর কথা, কিশোর ভারতীর প্রচারপুস্তিকা পৌঁছে দাও। কিশোর ভারতীর প্রতিটি সংখ্যা যদি আমরা অনেক বেশী ছাপতে পারি, তাহলে লোকসানের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। তাই আমরা চাই, কিশোর ভারতীর আলোক-বার্তা তোমাদের মুখে মুখে যেন ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে, আশ্চর্য আনন্দে বোঝাই কিশোর ভারতীর সোনার তরী যেন ভিড়তে পারে কিশোর ও তরুণ মনের বন্দরে বন্দরে। তোমাদের এই ভালবাসা ও সহযোগিতা যত দিন থাকবে, তত দিন জেনে রাখ কিশোর ভারতীর মৃত্যু নেই।

নিখিল সাহা, কুচবিহার

—কিশোর ভারতীর গ্রাহক হবার নিয়মাবলী কোথায় পাওয়া যায়?

ঃ ২য় বর্ষের ১ম, বা ৩য় যে কোন সংখ্যায় ওটা পাবে।

সজীবেন্দ্র দাস, হাফলং

—আঘাত থেকে মুক্তির পথ কি?

ঃ কোন পথ নেই ভাই, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে। হয় আঘাতকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করো এবং একান্তই যদি আঘাত আসে, তাকে শান্ত মনে গ্রহণ করো, আর নয়ত তার মোকাবিলা করার জন্য রুখে দাঁড়াও। অবশ্য আঘাত আছে বহু রকমের। সেই মহানজবাক্য কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে ঃ বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য.....

দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, খড়্গপুর

—ছবিতে হাস্যকৌতুকের ধারাবাহিক গল্প আমার খুব ভাল লাগছে। 'নন্টে ফন্টে' ধারাবাহিকভাবে বের হচ্ছে, সেজন্য আমরা খুব আনন্দিত। ধারাবাহিক উপন্যাসগুলি পড়েও খুব আনন্দ লাভ করছি।

ঃ বেশ বেশ।

বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ৯

—আমার মনে হয়, কিশোর ভারতীই বাংলা দেশের একমাত্র কিশোর পত্রিকা যার ভেতর আমাদের মনের খোরাক ঠিক আমাদেরই মনের মত করে ছাপা হয়।

ঃ এক কথায় সব কথাই বলে দিয়েছ তুমি! চমৎকার!

তাপস ও তুহিন ঘোষ, রায়গঞ্জ

—পৃথিবীর বয়স কত?

ঃ তিন শো কোটি বছরেরও বেশী।

—পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ধাতুর নাম কি এবং তা কোথা থেকে পাওয়া যায়?

ঃ রেডিয়াম সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু। ইউরেনিয়ামের আকরিকের সঙ্গে রেডিয়াম মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। রেডিয়াম সাদা চকচকে ধাতব দ্রব্য এবং খুব দুষ্প্রাপ্য। খুব অল্প পরিমাণে পাওয়া যায় বলে এর মূল্য অত্যন্ত বেশী।

বিমলকুমার শেঠী, অরঙ্গাবাদ

—কলকাতার সবচেয়ে আশ্চর্যজনক জিনিস কি?

ঃ এত রোগ-শোক, অভাব-অনটন, নোংরা আবর্জনা ও হামলা-মারামারির মধ্যে কলকাতাবাসী যে আজো টিঁকে আছে, সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্য। আশ্চর্য তার জীবনীশক্তি!

—জনসাধারণ ও নেতাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

ঃ নেতারা চালায়, জনসাধারণ চলে। অবশ্য নেতারা ঠিক-মত চালাতে না পারলে, জনসাধারণই একদিন আবার তাদের ইতিহাসের আঁস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু জন-সাধারণের চলা থামে না। নতুন নেতা নির্বাচন করে তারা চলতে থাকে। নেতারা আসে যায়, কিন্তু জনসাধারণ অজর অমর, তারা অবিরাম চলছে—কখনো ধীরে কখনো জোরে। ভারী মজার ব্যাপার,—তাই না?

প্রসূনকমল ভট্টাচার্য, মাইথন

—কিশোর ভারতী পড়ে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি ও উপকৃত হয়েছি। এত দিন গ্রাহক না হবার জন্য বেশ আপসোস লাগছিল। পত্রিকাটি পড়ে আমার কয়েকজন বন্ধু গ্রাহক হবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

ঃ এটা নিঃসন্দেহে সুখবর।

সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা

—ডঃ খোরানার আবিষ্কার কি?

ঃ বিষয়টি যেমন দুরূহ, তেমনি জটিল। অল্প কথায় বোঝানো দুষ্কর। তাছাড়া ওটা বুঝতে হলে বিজ্ঞানের উচ্চতর জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। ডঃ খোরানার আবিষ্কার জেনেটিক কোড সম্বন্ধে। কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোমোসোম থাকে। এই ক্রোমোসোমের মধ্যে থাকে জিন। বিজ্ঞানীরা মানে করেন, এই জিনের মধ্যে প্রোটিন তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া থাকে। ডঃ খোরানা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, কিভাবে জিনের সঙ্কেতে প্রোটিন তৈরি হয়।

বিনোদ নন্দন, ঝাঁঝা

—কিশোর ভারতীর প্রথম (শারদীয়া) সংখ্যা কি এখনও পাওয়া যায়? কিভাবে?

ঃ বাড়তি কপি নেই। অফিস কপি যা ছিল, তা-ও প্রায় শেষ হবার মুখে। তবু কিশোর ভারতী কার্যালয়ে কর্মাধ্যক্ষের নামে অবিলম্বে পাঁচ টাকা নব্বই পয়সা মনি অর্ডার করে পাঠালে এক কপি রেজেস্ট্রি করে পাঠিয়ে দেবার জন্য কর্মাধ্যক্ষকে অনুরোধ করতে পারি।

কিশোর ভারতী

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সুধীজনের সুচিন্তিত অভিমত

অমৃত

বংগ ভাষায় কিশোর পাঠকদের উপযোগী প্রচলিত গ্রন্থাদি বা পত্র-পত্রিকায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। অধিকাংশই ইতিহাস, রূপকথা, সামাজিক গল্প এবং নানান ধরনের হাল্কা জিনিসে পূর্ণ হয়ে থাকে। **'কিশোর ভারতী' পত্রিকার আত্মপ্রকাশের সংগে সংগে সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটিতে যে অভিনবত্বের সৃষ্টি হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।** আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংগে দুঃসাহসিক অভিযান, আবিষ্কারের কাহিনী, গোয়েন্দা কাহিনী, রোমাঞ্চকর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, ইতিহাসভিত্তিক গল্প, দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী, শিহরণ জাগানো ভ্রমণ কাহিনী, মনীষী জীবনের গল্পকথা, জল-স্থল অন্তরীক্ষের চমকপ্রদ গল্প, ইতিহাসের স্মরণীয় দিনগুলির বিচিত্র কাহিনী, শিকারের গল্প, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গল্প, হাসি ও কৌতুকের গল্প, বিজ্ঞানের সরস মধুর কাহিনী, শ্রেষ্ঠ বাঙালী লেখকদের রচনার পুনর্মুদ্রণ, জলদস্যুদের লোমহর্ষক কাহিনীতে কিশোর ভারতীর পাতা পূর্ণ হয়ে আছে। **অসংখ্য রেখাচিত্র, রঙিন ছবিতে সমস্ত বইটাই ঠাসা। এই অনন্য সংকলন (শারদীয়া) বাঙলা কিশোর সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ।...মুদ্রণ, সম্পাদনা এবং অংগসজ্জায় একটি আভিজাত্যের সুর স্পষ্ট।**

দৈনিক বসুমতী

...কিশোর ভারতীর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি সম্পূর্ণরূপে **কিশোর-কিশোরীদের জন্য হলেও** এই শারদ সংখ্যাটি পড়ে **বড়রাও প্রভূত আনন্দ পাবেন।**...আলোচ্য সংখ্যাটিতে তিনখানি উপন্যাস, দুইটি বড় গল্প, মজাদার তিনটি গল্পসহ ৭০।৭৫টি বিভিন্ন স্বাদের নানা রসের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ছোটদের আনন্দদায়ক গল্প, কাহিনী, কবিতা ও ছড়াতে সমৃদ্ধ হয়েছে।.....খেলাধুলো, ব্যায়ামসহ প্রতিটি দপ্তর বেশ সারগর্ভ।...সম্পাদনের কাজ সুন্দর হয়েছে। এই বৎসরের কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী বহুল শারদ সংকলনের মধ্যে কিশোর ভারতী আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, যে কোন পাঠকের মন জয় করতে সক্ষম হবে।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

পত্রিকার আশ্চর্য সুন্দর চরিত্রও আমাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে। **স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী এত ভাল আর এমন সার্থকভাবে সম্পাদিত পত্রিকা ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখিনি।**

ধীরেন্দ্রলাল ধর

কিশোর ভারতী বিশেষত্বের দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।...স্বাধীন দেশের কিশোর কিশোরীদের মনকে যুগোপযোগী চিন্তাধারার সংগে পরিচিত করার চেষ্টা এর সম্পাদনায় দেখা যায়। 'খোলামনের মেলাতে' ও 'শরীরটাকে গড়ে তোল' সহজেই সম্পাদনার বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে।...**কিশোর ভারতী কিশোরদের জন্য একখানি সেরা মাসিকপত্র একথা আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি।**

নারায়ণ সান্যাল

কিশোর ভারতী প্রত্যেকটি সংখ্যাই খুব ভাল লাগছে...**কিশোর ভারতী শুধু কিশোর মহলেই নয় বড়দের মধ্যেও রীতিমত সাড়া জাগিয়েছে।...**

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

...প্রথমেই আপনাকে আপনার সুসম্পাদনার জন্য অভিনন্দন জানাই। আপনি যে রকম অকৃপণ হস্তে কিশোর ভারতীর Get-up-এর জন্য খরচ করছেন তা প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই। **ভিতরের খেলা-গুলিও বেশীর ভাগই উঁচু মানের এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ।... (সম্পাদককে লেখা পত্র)**

বিদ্যোদয়ের বই

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
এক জাহাজ গল্প

প্রথম সংগ্রহ : **ময়ূরপঙ্খী** [৬·০০]
দ্বিতীয় সংগ্রহ : **মকরমুখী** [৬·০০]
তৃতীয় সংগ্রহ : **সাগরদাঁড়ী** [যন্ত্রস্থ]

ছোটদের জন্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র একাই এক অপরূপ গল্পের মায়াপুরী গড়ে তুলেছেন। কি সেখানে নেই? পরীদের পাখার শব্দের মত স্বপ্নঝিমঝিম গল্প আছে, আছে ইতিহাসের ঝলমলে রঙিন গল্প, রক্তে দোলা লাগানো গল্প দুরন্ত দুঃসাহসের, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করা গল্প রহস্যের, আছে গায়ে কাঁটা দেওয়া ভয়ের গল্প, মজাদার কৌতুকের যেমন, তেমনি অতি মিষ্টি মন জুড়িয়ে দেওয়া গল্প আর আছে বিজ্ঞানের ভেলকি দিয়ে বানানো আশ্চর্য সব গল্প যাতে তাঁর জুড়ি নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই সব গল্প একত্রে সংগ্রহ করে **এক জাহাজ গল্প** সংকলনে প্রকাশ করা হল। কিশোরদের জন্যে তাঁর যাবতীয় গল্পের (ঘনাদার গল্পের নমুনা সহ) এ-ধরনের সংকলন এই সর্বপ্রথম।

প্রথমে আঠারোটি বিচিত্র স্বাদের গল্পের পণ্যে সমৃদ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়েছে **ময়ূরপঙ্খী**। যশস্বী শিল্পী সূর্য রায়ের আঁকা ছোটয় বড়য় মিলিয়ে ছত্রিশখানি অপরূপ ছবি ও বহুবর্ণরঞ্জিত প্রচ্ছদপট **ময়ূরপঙ্খী**-কে সাজিয়েছে নয়নাভিরাম সাজে।

ময়ূরপঙ্খী-র পরেই সাজোসাজো রবে বার হয়েছে **মকরমুখী** সতেরটি নানান রসের গল্পের সওদায় বোঝাই হয়ে। যেমনি আশ্চর্যসুন্দর সব গল্প, তেমনি চোখ-জুড়োন এর ছবির বাহার আর প্রচ্ছদপটের বুঝি তুলনা নেই। এর ছবিগুলিও এঁকেছেন সূর্য রায়। ছোটয় বড়য় এতো ছবির সংখ্যা চৌত্রিশ।

সবশেষে আসছে **সাগরদাঁড়ী**।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের আর কয়েকখানি বই

শুক্রে যারা গিয়েছিল [৩·০০] **ড্রাগনের নিঃশ্বাস** [২·২৫] **গল্প আর গল্প** [২·২৫]

আরও কয়েকখানি বই

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র	৬·০০	সংকলন
সাইবিরিয়ার শেষ মানুষ	২·০০	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
স্বর্ণমুকুট	২·৫০	গোপেন্দ্র বসু
আনন্দমঠ	২·০০	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দারুমূর্তির রহস্য	১·৬২	মণীন্দ্র দত্ত
সুন্দরবনের চিঠি	১·৬২	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯ * ফোন : ৩৪-৩১৫৭